ডাঃ সৌমিত্র ঘোষ

ফিরে দেখা
স্মৃতি কথা

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Dr Soumitra Ghosh 2026

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication,
please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7310-226-9

Concept of the cover and illustrations: Dr Soumitra Ghosh
Cover design: Sukanta Dasgupta
Illustrations: Atanu Chatterjee
Typesetting: Tanya Raj Upadhyay

First Edition: January 2026

ফিরে দেখা স্মৃতি কথা

অর্পণ—

সৈনিক স্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ,

সিনিয়র দাদা আর প্রিয় বন্ধুদের—

যাঁদের শিক্ষা, শাসন আর স্নেহে গড়ে উঠেছিল আমার শৈশবের ভিত।

আজও তাঁদের মুখ, তাঁদের হাসি, তাঁদের ডাক

স্মৃতির পটে অমলিন।

এই বই তাঁদেরই প্রতি

আমার নীরব কৃতজ্ঞতার অর্পণ।

কেন এই লেখা?

সত্যি বলতে কি এই লেখাগুলো কোনো পরিকল্পনা করে লেখা হয়নি বা বই বের করব বলেও লিখিনি। মনে বিভিন্ন সময়ে যখন পুরোনো স্মৃতি এসে ধাক্কা দিয়েছে তখন খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেই মনের ভাব লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। লেখার পরেই আমাদের ৭২ সনের সৈনিক স্কুলের গ্রুপে পোস্ট করতাম আর দেখতাম বেশিরভাগ বন্ধুরা খুব 'নস্টালজিক' হয়ে আমাকে আরও লেখার জন্য চাপ দিতে থাকে। আসলে স্মৃতি হচ্ছে কতকটা বদহজমের মতো। আর বদহজম হলে ঢেকুর উঠবেই। সেইজন্য মাঝে মাঝে ঢেকুর উঠেছিল আর আমি সেগুলো লেখার আকারে প্রকাশ করেছি।

এই লেখার শুরুটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ২০১০ সালে আমার মেয়েকে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে প্রথম হোস্টেলে রেখে ফিরে আসছি। হঠাৎ খেয়াল হল তারিখটা ২৬শে জুলাই। উনিশ-শো বাহাত্তর সালে এই দিনটাতেই আমাকে দশ বছর বয়সে সৈনিক স্কুলের হোস্টেলে রেখে আসা হয়েছিল! আর কাকতালীয়ভাবে একই দিনে আমার মেয়েকে আমি হোস্টেলে রেখে এলাম। চোখের সামনে সেদিন ভেসে উঠেছিল আমার স্কুলের প্রথমদিন। ব্যাস, সেই লেখার শুরু।

‘নস্টালজিয়া’ বা ফিরে দেখা মনে করিয়ে দেয় সেই পুরানো উদ্ধৃতি, স্মৃতি ‘সততই সুখের’ কিন্তু স্মৃতি কি সবসময়ই সুখের?

নস্টালজিয়া মানে অতীতের স্মৃতি নিয়ে আবেগে ভেসে যাওয়া। এটা এমন-এক অনুভূতি, যেখানে আমরা পুরোনো দিনগুলোকে এখনকার চেয়ে অনেক ভালো মনে করি। আসলে, এটা একধরনের মানসিক বিভ্রম—যেটা আমাদের মনে করায়, আগে সবকিছু অনেক সুন্দর ছিল।

আমরা যখন পুরোনো কথা মনে করি, তখন সব ভালো জিনিসই বেশি মনে পড়ে, খারাপগুলো ভুলে যাই। এটা সত্য ঘটনা নয়, বরং মনের তৈরি কিছু ভালো স্মৃতির ওপর দাঁড়ানো।

জগজিৎ সিং-এর সেই বিখ্যাত গানটা মনে আছে? ‘ওহ কাগজ কি কাশতি, ওহ বারিস কা পানি।’—এটাও একই অনুভূতির প্রকাশ।

মানুষ অতীতের এমন একটা ছবি কল্পনা করে যেখানে সে একেবারে নির্দোষ, সুখী ও নিরাপদ ছিল—যা আসলে বাস্তব নয়। যেমন স্কুল-কলেজের দিনগুলো মনে পড়লে অনেকেই শুধু মজা, বন্ধু, ঘোরাফেরা এসব মনে রাখে—কিন্তু ভুলে যায় সেই পরীক্ষার চাপ, টাকার টানাটানি, বা কঠিন কড়া স্যারদের কথা। এইভাবে শুধু ভালো দিকগুলো মনে রেখে, আমরা অতীতকে

অনেক বেশি সুন্দর মনে করি। সত্যি কথা হল—নস্টালজিয়া একরকম আবেগপ্রবণ প্রতারণা।

পুরোনো দিনের জিনিস এখন ফিরিয়ে আনলেও, সেই আগের আনন্দ আর ফিরে আসে না। ঠিক সেইরকমই হয়েছিল ২০১২ সালে সৈনিক স্কুল ছাড়ার চল্লিশ বছর পর যখন আবার স্কুল রিইউনিয়নে আমাদের স্কুলে ফিরে গিয়েছিলাম। অতীতের সঙ্গে সবকিছু ঠিকভাবে মেলাতে পারছিলাম না। আমরা নিজেরা বয়সে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে; বড়ো হয়ে গিয়েছি, যার জন্য মনের মধ্যে আগের দেখা স্কুলের জলছবি ঠিক মিলছিল না। সেই পুরোনো স্কুলের উঁচু লম্বা জলের ট্যাঙ্কটা আর অত উঁচু লাগছিল না। আসলে আমরাই তো তখন অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছি।

কেন এই লেখা—

এই লেখাটাকে আঁতুড়ঘর থেকে বাইরে বই আকারে নিয়ে আসার পিছনে অনেকের হাত আছে। উৎসাহ দিয়ে ও কিছু ভুলত্রুটি শুধরে দিয়ে প্রতিটা পর্বে আমাদের স্কুলের ক্লাসমেটরা যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমাকে। প্রথমত কাজল প্রথম থেকে শেষ অব্দি তার নিজস্ব স্টাইলে নিজস্ব সৎ অভিমত দিয়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছে। আলোক, কানাডা থেকে দেবাশীষ দাস, শঙ্কর রাউত ও অপূর্ব অনেক ভুলত্রুটি ও সময়ের হিসেব ঠিক করতে সাহায্য করেছে। শান্তনু, মিলন, অভিজিত, সমীর মাইতি, সরোজ কুণ্ডু, সৌমিত্র নিয়োগী, দেবাশীষ দত্ত, দলজিত, ও আরো অনেকে

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে, আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। সুকান্ত, গৌতম মণ্ডল, শৌভিক, পার্থ ব্যানার্জি, তপন পাত্র, গৌর গোপাল, দেবাশীষ ভৌমিক, শিশির, সমির দাস, রতন, অরিন্দম, অর্ণব, অভয়, সঞ্জয় ও বন্ধু পত্নী মৌসুমী, সুপর্ণা, চিত্রা, রমা, মৌরি, সরিতা, রত্না, আভা ও আরো অনেকে লেখাগুলো পড়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছে তাদের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। এই বইয়ের যত সাদা কালো ইলাস্ট্রেশন আছে সবগুলো এঁকেছে আমাদের সৈনিক স্কুলের বন্ধু অতনু চ্যাটার্জি। অতনু বিনা পারিশ্রমিকে আঁকার জন্য রাজি হয়ে গিয়েছিল। তাকে আমার তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ। এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে সাহায্য করেছে আমাদের ব্যচমেট সুকান্ত দাশগুপ্ত। আমার তিন নম্বর বইয়ের প্রচ্ছদও সুকান্ত বিনা পারিশ্রমিকে বানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং এবারও তাকে নির্দ্বিধায় প্রচ্ছদ আঁকতে অর্ডার দিয়েছিলাম। সুকান্ত যথারীতি কাজটা সুচারুভাবে করেছে। তাকে এখানে শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করব না।

শেষ পর্যায়ে অশোকদা ও আমাদের আলোক আমাদের সৈনিক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, এয়ার-চিফ-মার্শাল অরূপ রাহা স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। তিনিই এই বইয়ের অমূল্য ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, তাঁকে জানাই আমার অশেষ ধন্যবাদ। এই বইয়ের বানানগুলো শুদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে

আমার বোন মিলুর সঙ্গে পীযূষ, আর আমার প্রিয় রাঙা মামা। তাঁদেরকে আমার ভালোবাসা জানাই।

তবু শেষমেষ আমি বলব, ‘স্মৃতি সততই সুখের’। আমাদের মাতৃতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে আমি চিরদিন মনের গভীরে যত্ন করে তুলে রাখব। দূর থেকে রোজ প্রণাম জানাব।

“...হে ঐশ্বর্যবান
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।”

ভূমিকা

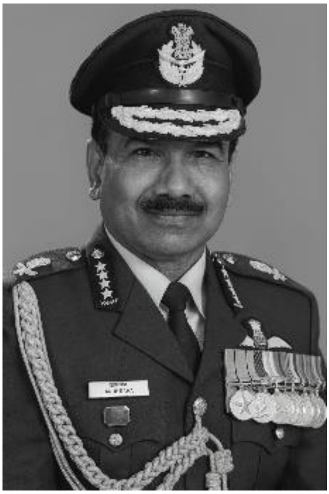

ফিরে দেখা স্মৃতি কথা হাতে নিয়ে আমার ভেতরটায় যেন ঢেউ খেলল। সৈনিক স্কুল পুরুলিয়ার সঙ্গে যাদের শৈশব-কৈশোর গাঁথা, তাদের কাছে এই বই কেবল কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতির সংকলন নয়—এটি এক প্রজন্মের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। লেখক তাঁর কলমে তুলে ধরেছেন সেই দিনগুলোর রঙ, ঘাম, হাসি আর অশ্রু, যা আমাদের সবার জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে।

পাতা উলটাতে উলটাতে আমি যেন আবার ফিরে গেলাম সেই লালমাটির মাঠে, ভোরের সাইরেনের ধ্বনিতে, এন.সি.সি. বুটের ঠকঠক শব্দে, ডাইনিং হলের কড়া শৃঙ্খলায়, আর শনিবারের আড্ডার প্রাণখোলা হাসিতে। লেখক নিজের অভিজ্ঞতা বললেও, তাঁর প্রতিটি বর্ণনার ভেতরে আমরা—পুরুলিয়ার অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্ররা—নিজেদের ছায়া খুঁজে পাই।

এই বইয়ের বড়ো গুণ হল এর সরলতা ও অকপটতা। কোথাও বাড়তি অলংকার নেই, নেই অতিরিক্ত আড়ম্বর। ঠিক

যেমন করে স্মৃতি আমাদের মনে ভেসে ওঠে—মাঝে মাঝে কাঁচা, মাঝে মাঝে মধুর, আবার কখনও দুষ্টুমিতে ভরা—তেমনি ভঙ্গিতেই লেখা হয়েছে এই আত্মকথন। তাই বইটি কেবল একা লেখকের নয়, হয়ে উঠেছে আমাদের সবার মিলিত কণ্ঠস্বর।

আজকের পাঠকের কাছে—সে প্রাক্তন ছাত্র হোক বা বাইরের কেউ—ফিরে দেখা স্মৃতি কথা হবে এক অনন্য যাত্রা। এই বই শেখায় যে শৈশবের শৃঙ্খলা ও সংগ্রামই পরবর্তী জীবনের ভিত, আর সেই দিনগুলির স্মৃতিই আজীবনের সম্পদ।

আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ যে এই স্মৃতি কথা লেখা হয়েছে। এটি এক প্রাক্তন ছাত্রের নয়, বরং আমাদের সবার গল্প—এবং এক বৃহত্তর অর্থে, ভারতের পরিবর্তনশীল সময়ে বেড়ে ওঠা এক প্রজন্মের গল্প। আমার বিশ্বাস, ফিরে দেখা স্মৃতি কথা পাঠককে হাসাবে, ভাবাবে, আর হয়তো একফোঁটা চোখের জলে ভিজিয়েও দেবে।

গভীর ভালোবাসা ও গর্ব-সহ,

এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা

পি.ভি.এস.এম.

এ.ভি.এস.এম., ভি.এম., এ.ডি.সি.

ও সৈনিক স্কুল পুরুলিয়ার প্রাক্তন ছাত্র

সূচিপত্র

পুরুলিয়ায় প্রবেশ 1
স্কুলের প্রথমদিন 11
'সাবধান-বিশ্রাম-তেজ-চল্' 18
পি.টি. ও ডাইনিং 23
স্কুল ক্যাম্পাস 30
স্কুলের হাসপাতাল 37
পানিশমেন্ট-শাস্তি 44
জুতো পালিশ 50
পিকনিক 56
নাগা বন্ধুরা 60
কৈশোরের দোরগোড়ায় 65
'গেমস ও কোক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিস' 73
গান বাজনা নাটক/ ইন্টারহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 79
পেরেন্টস্ ডে 86
চিলেকোঠা 93
পাগলা দাশু 98
শনিবারের আড্ডা 105

বক্সিং খেলা 112
আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট ক্লাস 117
ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল, লাগল যে দোল 126
স্কুলের স্যারেরা 131
আমাদের স্যারেরা 140
আমাদের স্কুল লাইব্রেরি..155
কলকাতা প্যারেড..163
আমাদের গোপালদা..171
"উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে..." 177
আমাদের বন্ধু প্রদীপ বরুয়া 189
'দিল্লি চলো'—লঘু পাপে গুরু শাস্তি...................................197
মৃত্যুর মুখোমুখি..201
স্কুল পালিয়ে রফি নাইট...209
'স্কুলের অ্যানুয়াল ডে' 215
স্কুলের নিষিদ্ধ জায়গাগুলো..221
বায়োস্কোপ, ছায়াছবি ও সিনেমা.......................................226
"জো পকরা গেয়া ও চোর হ্যায় ঔর নেহিতো সব শরিফ"..235
"ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি" 242
উত্তরকথা..249

পুরুলিয়ায় প্রবেশ

আমার চোখটা যে কখন লেগে গিয়েছিল সেটা মোটেও টের পাইনি। হঠাৎ চোখ মেলতেই দেখলাম আমাদের ট্রেনটা একটা স্টেশনে ঢুকছে। স্টেশনে ঢোকার মুখেই একটা হলুদ রঙের বোর্ডে বড়ো বড়ো করে বাংলা লেখাটা পড়তে পারলাম—পুরুলিয়া। মায়ের দিকে তাকানোর আগেই দেখলাম জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে, নামার প্রস্তুতি চলছে।

সেই সক্কাল থেকে চারবার ট্রেন বদল করে তবেই-না সেই রামপুরহাট থেকে পুরুলিয়া পৌঁছোনো। সেদিন সঙ্গে মা আর মেসোমশায় ছিল। বাবাকে তো আমি দেখিইনি। আমার এক বছর বয়স হওয়ার আগেই আমার বাবা মারা যান। তাই বাবার কোনো স্মৃতি মনে থাকাও সম্ভব নয়। এমনকী বাবার চেহারার কোনো অবয়বও মনে নেই। ছোটো থেকেই আমার জন্য বাবার জায়গা ফটোতে।

যারজন্য আমার গার্জেন বলতে মা-ই। এখনকার ভাষাতে ‘সিঙ্গল পেরেন্টিং’। কিন্তু যতই হোক এতদূর আসার জন্য একজন পুরুষ মানুষ তো দরকার তাই সেই মেসোমশায়কে সঙ্গে নিয়ে আসা।

আসার সময় একে গোটা দিনের ধকল সেইসঙ্গে গোটা রাস্তা ট্রেনের কয়লা-ইঞ্জিনের কয়লাগুলো ক্রমাগত ঝাপটা মারছিল জানলা দিয়ে। যারজন্য কালো ছেলের মুখ আরো কালো হয়ে গিয়েছিল সেদিন। হয়তো-বা বাড়ি ছাড়ার দুঃখ মুখে কিঞ্চিৎ প্রভাব ফেলেছিল। শরীরে কষ্ট হলেও সেদিন আমি বুঝতে দিইনি কেন-না ভিতর থেকে একটা চাপা আনন্দ ও কৌতূহল উঁকি মারছিল।

আসলে আমাকে বলা হয়েছিল আমাকে বোর্ডিং স্কুলে রাখা হবে। তখন উনিশ-শো বাহাত্তর সন, আমার বয়স তখন সবে দশ বছর। আমি মফস্সলের স্কুলে সবে ফাইভে উঠেছি। পড়াশোনায় আমি বরাবরই ভালো, ক্লাসে স্ট্যান্ড করি। ইশকুলে ‘ভালো ছেলে’ বলে নাম ছিল। কিন্তু দু-জন পিঠোপিঠি দুই ভাইকে মানুষ করতে আমার বিধবা মাকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ করে সৈনিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার আবেদনপত্রর জন্য বাংলা খবর কাগজের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে যায়।

তারপর ফর্ম ভর্তি করা, ঘরে অঙ্ক প্রাকটিস করে পুরুলিয়ায় এসে পরীক্ষায় বসা। বাংলা মাধ্যমেই পরীক্ষা হয়েছিল তাই অসুবিধা হয়নি খুব একটা। প্রথম পেপারটা ছিল একশোটা সরল অঙ্ক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—পনেরো মিনিটে শেষ করতে হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে আমি আটানব্বইটা অঙ্ক করছিলাম। দ্বিতীয় পেপারে পঁচিশটা বড়ো বড়ো অঙ্ক ছিল। আর তৃতীয় পেপারে বাংলা প্যাসেজ পড়ে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়েছিল। এগুলো করতে আমার ভালোই লেগেছিল এবং ভালো করে উতরেও গিয়েছিল। কিন্তু শেষের পেপারটা ছিল ইন্টালিজেন্ট টেস্ট, আমার কাছে তা ছিল একেবারেই আনকোরা। পরীক্ষা দিতে হবে তাই দিয়েছিলাম অত মাথা-ছাতা বুঝিনি। আমাকে বাড়ি থেকে বলা হয়েছিল, আমাকে কোনোএকটা- বোর্ডিং স্কুলে রাখা হবে। বোর্ডিং মানে জানতাম বাড়ির থেকে দূরে কোথাও কড়া শাসনে থাকতে হবে এবং রোজ কুমড়োর ঘ্যাঁট আর ভাত-ডাল খেতে দেওয়া হবে। বাড়ির লোকজনদের মুখে কানাঘুষোয় শুনেছিলাম যে এটা নাকি একটা মিলিটারি স্কুল। কিন্তু তার মানে কিছুই তখন বোধগম্য হয়নি।

“চল্ চল্ ব্যাগটা ধরে তাড়াতাড়ি নাম...”। তাড়াতাড়ি মায়ের পিছন পিছন স্টেশনে নামলাম। ট্রেনের সিঁড়ি থেকে প্ল্যাটফর্ম ছিল অনেকটাই নীচে তাই লাফ দিয়ে নামতে হয়েছিল। লাল মোরাম ফেলা প্ল্যাটফর্ম। আমি অবাক-কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে

চারিদিক দেখতে দেখতে স্টেশন থেকে বেরোলাম। আমাদের এত জিনিসপত্র ছিল যে কুলি নিয়ে রিকশা স্ট্যান্ড অব্দি যেতে হয়েছিল। ও মা! ওখানে তো সব অদ্ভুত ধরনের রিকশা। দেখতে একটু খাটো আর মাল রাখার জায়গাটা রিকশার পিছন দিকে। জিনিসপত্র-সহ তিনজন একটা রিকশাতে উঠে শেষ বিকেলের আলোয় অল্প-পয়সার একটা সস্তার হোটেলের সামনে এসে পৌঁছোনো গেল। হোটেলের সামনে তখন ‘বেঙ্গল বোর্ডিং’ নামটা পড়ে ভেবেছিলাম এটাই বোধহয় আমার গন্তব্যস্থল। এই বোর্ডিঙেই আমাকে থাকতে হবে। আমার ভুল ভাঙল যখন বুঝলাম এখানে এক রাত থেকে পরের দিন সকালে স্কুলের বোর্ডিঙে যেতে হবে। কাকতালীয়ভাবে হোটেলের নামটা ছিল ‘বেঙ্গল বোর্ডিং’। বেশ সরু এঁদো রাস্তা দিয়ে ঢুকে দাঁড়ালাম একটা টেবিলের সামনে। সেখানে এক দশাশয় ভুঁড়ি নিয়ে চেককাটা লুঙি পরে বসেছিল হোটেল ম্যানেজার। তারপর রুমে ঢুকে কখন রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর মনে নেই।

পরেরদিন সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম স্কুলের হোস্টেলে থাকার জিনিসপত্র নিয়ে। আবার পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সেই অদ্ভুত ধরনের রিকশাতে উঠে রওনা হলাম। সেদিন সঙ্গে ছিল একটা কালো ট্রাঙ্ক তার গায়ে সাদা রঙ দিয়ে ইংরেজিতে লেখা ছিল আমার নাম। তার নীচে লেখা ‘সৈনিক স্কুল পুরুলিয়া’।

স্কুল শহর থেকে অনেক দূরেপ্রায় , পাঁচ-ছয় কিলোমিটার হবে। সেদিন অতটা পথ রিকশায় চড়ে যেতে আমার মন্দ লাগেনি।

দিনটা ছিল ছাব্বিশে জুলাই ১৯৭২, বারটা ঠিক মনে নেই। গোটা রাস্তা চোখ বোলাতে বোলাতে একটা বাঁক পেলাম ঠিক তখনই চোখে পড়ল খালি জায়গার মধ্যে ঝাঁ-চকচকে স্কুল বিল্ডিং। চারিদিকে ধু-ধু মাঠ। যত এগোতে থাকলাম স্কুল চত্বরটা আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম। এত সুন্দর আর বড়ো স্কুল বিল্ডিং দেখে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! একটা লম্বা হলঘরে আমাদের বসার বন্দোবস্ত করা ছিল। দেখি আমার মতো অনেক ছেলে তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে সেই হলঘরে বসে আছে। পরে জেনেছিলাম এটাই স্কুলের অ্যাসেম্বলি হল। একই বয়সী সবাই সুতরাং আলাপ জমাতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি।

এক এক করে আমাদের নাম ডাকা হল এবং হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল ভর্তির কাগজপত্র। সেইসঙ্গে পেলাম একটা রোল নম্বর আর হোস্টেলের নাম। আমার কপালে এল—টেগোর হাউস, রোল নম্বর ৬৪০। রোল নম্বর এত বড়ো হয় নাকি? আগের মফস্সলের স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্ট অনুযায়ী রোল নম্বর দেওয়া হত। পরে বুঝেছিলাম এখানে রোল নম্বরটাই আসল। স্কুল আরম্ভ হওয়ার প্রথমে যে ভর্তি হয়েছে সে এক নম্বর আর ক্রমান্বয়ে আমার পালায় ৬৪০ এসেছে। যতদিন এই স্কুলে থাকা হবে ততদিন এই রোল নম্বর পালটাবে না। এমনকী হোস্টেলও

পালটানো যাবে না। তার মানে সারা স্কুলজীবন টেগোর হাউসেই থাকতে হবে। এখানে হোস্টেল বা বোর্ডিং বলা হয় না বলা হয় ‘হাউস’।

রোল নম্বর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা দেশলাই কাঠি নিয়ে মার্কিং ইঙ্ক দিয়ে প্রত্যেকটা প্যান্ট-শার্টে রোল নম্বর আর হাউসের নাম লেখা হল—640/Tg.। ততক্ষণে আমি সঙ্গীও পেয়ে গিয়েছি। বেশিরভাগ ছেলেরাই এসেছিল কলকাতা শহর থেকে। একজন ছেলে খালি আমার কাছের জেলা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিল।

ওইসব কারবার দেখে আমার তো বেশ আনন্দ হচ্ছিল। আজ থেকে এই ট্রাঙ্ক আর হোল্ডলের মালিক আমি। আমি স্বাধীন! বাড়ির মতন আর কেউ আমার ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে না।

কিন্তু আমার এই বালক-ভুল ভেঙেছিল পরেরদিনই। এখানে সবকিছুই চলে হুকুমে। সমস্তটাই যেন কড়া শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মে বাঁধা!

প্রায় দুপুর দেড়টা নাগাদ একজন এসে বলে গেল, নতুন ছাত্ররা সবাই ডাইনিং হলে লাঞ্চ করবে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একজন সিনিয়র দাদার সঙ্গে গেলাম ডাইনিং হলে। তখন অনুভব করলাম ভীষণ খিদে পেয়েছে। এত বড়ো খাবার হলঘর দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। চারিদিকে সার দিয়ে পরপর

টেবিল সাজানো আর বসার চেয়ারগুলো টেবিলের পেটে ঢোকানো। একটা টেবিলে ছয়জনের বসার ব্যবস্থা কিন্তু ছেলেরা কেউ বসছে না। সবাই চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে। স্কুল ক্যাপ্টেন হুকুম না দিলে বসার উপায় নেই। আমরা নিজেদের মধ্যেই গুজুর গুজুর করছিলাম, হঠাৎ টেবিলে চামচ ঠোকার শব্দ শুনে দেখলাম, স্কুল ক্যাপ্টেন জোরে জোরে ইংরেজিতে কিছু বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার টানার শব্দ...ঠক্...ঠক্...ঠক্। বেশ অনেকদিন পরে স্কুল ক্যাপ্টেনের ইংরেজি প্রার্থনাটা বোধগম্য হল, “Let us be thankful for what we are going to receive” আর খেয়ে ওঠার সময়, “Let us be thankful for what we have received.” তবে বসার পর খাব কি, খেতে হবে চামচ আর কাঁটা হাতে নিয়ে। বাঙালি জীবনের অভ্যস্ত খালি হাতে খাওয়া যাবে না। এ-কী রে বাবা! চামচ কাঁটা এগুলো তো সাহেবদের দেশে চলে, কখনো-বা রেস্টুরেন্টে কাটলেট খেতে হলে চামচ দিয়ে খেতে হয়। তখন সেই সিনিয়র দাদা বলল, “আজকে সবাই হাত দিয়ে খেয়ে নাও, কিন্তু আগামীকাল থেকে রোজ কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে হবে।”

লাঞ্চের পর সেই দাদা আমাকে নিয়ে গেল কোয়ার্টার মাস্টারের অফিসে। সেখান থেকে আমার খাকি জামা-প্যান্ট, চাদর, বালিশ আর কতসব জিনিসপত্র দেওয়া হবে। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সেসব নিতে নিতে প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। এ তো

আর গেলাম ,চললাম গোছের নেওয়া নয়-নিলাম-হিসেব করে সবগুলোতে আমার রোল নম্বর ও হাউসের নাম লিখে বুঝিয়ে দেওয়া হল কোনটা কখন ব্যবহার করতে হবে। এবং যদি ভবিষ্যতে এই জামা-প্যান্ট ছোটো হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায় আবার এখানেই কনডেম বলে ফেরত দিতে হবে।

সেইদিন সেই উঁচু ক্লাসের দাদাটাকে সাক্ষাৎ দেবদূত মনে হচ্ছিল। সেই পাতলা, শ্যামলা, লম্বা চেহারার দাদার নাম ছিল পার্থ। সে ক্লাস এইটে পড়ত।

সব জিনিসপত্র ব্যাগে বেঁধে যখন হোস্টেলের দিকে ফিরছিলাম তখন দেখলাম একটু দূরেই মা আর মেসোমশায় দাঁড়িয়ে আছেন। পার্থদা বলল, “যাও ওঁদেরকে প্রণাম করে নাও আর ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে না। এখন থেকে এখানে একাই থাকতে হবে তোমাকে।” মনে আছে, সেদিন মনটা কেমন যেন করছিল, বুকের ভিতর থেকে একটা দলা পাকানো কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। মাকে দেখলাম শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে। মা ও মেসো দু-জনকে প্রণাম করে আর পিছনে তাকালাম না। সোজা টেগোর হাউসের দিকে হাঁটা দিলাম। যেতে যেতে সেই পার্থদা অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল, “আমিও কেঁদে ছিলাম যেদিন আমাকে আমার মা-বাবা প্রথম এখানে রেখে যায়...।” হোস্টেলে যেতে যেতে এখানকার ডেলি-রুটিনটা বুঝিয়ে দিয়েছিল ঠিক যেন আমার মেন্টর।

আমার ঠাঁই হয়েছিল টেগোর হাউসের নয় নম্বর রুমে। সেই রুমে আমাকে নিয়ে মোট দশজন ছাত্র ছিল। রুমের দু-পাশে চারটে করে ওয়ার্ডোব আলমারি আর বিছানা পাঁচটা করে দু-পাশে দশটা। আলমারিগুলো রুমের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো। আলমারির একটা খোপে হ্যাঙ্গার ঝোলানোর জায়গা, ওপরে কাপড়চোপড় রাখার জায়গা। আর নীচে জুতো, হোল্ডল রাখার জায়গা ছিল। আর মাঝ-বরাবর র‍্যাকটা ছিল খোলা সেখানে ছোটোখাটো জিনিস রাখা যেত। বাড়ির থেকে আনা কালো ট্রাঙ্কটা খাটের তলায় তালা মেরে ঢুকিয়ে দিলাম। সেটা ছিল টেপা তালা, চাবি দিয়ে খুলতে হবে কিন্তু টিপে দিলেই লেগে যাবে। তালা টিপে বন্ধ করার সময় যদি চাবিটা ট্রাঙ্কেরিল ভিতরে থেকে যায় তাহলে পরবর্তীকালে তালা ভাঙা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সন্ধের সময় হাউসমাস্টার এলেন। বুঝিয়ে দিলেন স্লিপিং সুট পরে ঘুমোতে আর মশারি টাঙিয়ে গুঁজে নিতে। রাত্রি দশটার মধ্যে লাইট অফ করে ঘুমিয়ে পড়তে হবে যাতে সকালে পি.টি.-র জন্য সাড়ে পাঁচটায় সাইরেন শুনলে উঠতে অসুবিধা না হয়। প্রথমদিন রাত্রের খাওয়া-দাওয়া করে সবাই গোমরা মুখ করে রুমে ফিরল। এই প্রথম বোধহয় সবাই নিজের বাড়ির বাইরে একা বিছানায় শোবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই গুমোট ভাব কাটল যখন সবাই ঢলঢলে বেঢপ সাইজের স্লিপিং সুটের আপার আর লোয়ার পড়ে দাঁড়াল। তখন একে অপরকে দেখে হেঁসে লুটোপুটি খেতে লাগলাম আমরা। আমাদের মধ্যে একজন

পুরুলিয়া জেলার গ্রামের ছেলে ছিল যার নাম ছিল বিকাশ। সে বেশ ছন্দ দিয়ে পুরুলিয়া ভাষায় গান ধরল, "টাহুক টাহুক..."।

প্রথমদিন সবাই মশারির ভিতরে ঢুকে গল্পগুজব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেদিন কে লাইট অফ করেছিল সঠিক মনে নেই।

ঘুম ভাঙল ছেলেদের চেঁচামেচিতে আর ভোঁ শব্দে বাজতে থাকা সাইরেনের আওয়াজে। সকাল হয়ে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে সাদা হাফ প্যান্ট, সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি ও সাদা মোজার সঙ্গে কেডস পরে 'পি.টি.' করতে যেতে হবে। আমি হতভম্ব হয়ে জিগ্যেস করলাম "'পি.টি.' আবার কী?" "পি.টি. মানে Physical training, ব্যায়াম করতে হবে।

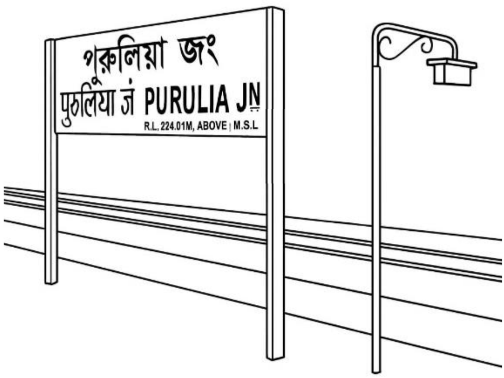

স্কুলের প্রথমদিন

প্রথমদিন ব্রেকফাস্ট করার পর আমাদেরকে স্কুল চত্বরে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর একটা লম্বা জায়গাতে সবাই ক্লাস অনুযায়ী দাঁড়াল। জায়গাটার দু-দিকে ক্লাস বিল্ডিং দিয়ে ঘেরা। একটা দিক খোলা যেদিকে রাস্তায় যাওয়া যায়, যেদিক দিয়ে আমরা লাইন করে এসেছিলাম। ঠিক তার উলটোদিকে মেইন স্কুল বিল্ডিঙের করিডর। সেদিকেই একটা উঁচু জায়গাতে একটা লম্বা ডেস্ক দাঁড় করানো। পরে জেনেছিলাম এটাকে Podium বলা হয়। যেটাতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

স্কুল ক্যাপ্টেন গোটা জিনিসটা পরিচালনা করছিল। স্কুল ক্যাপ্টেন বেশ গম্ভীর প্রকৃতির। শারিরীক আকৃতি ও মুখের মধ্যে একটা পাহাড়িয়া ছাপ আছে। কিছুক্ষণ পর তিনজন স্যার খাকি ড্রেস পরে এসে ছাত্রদের উলটো দিকে দাঁড়ালেন। একজন হেডমাস্টার, একজন রেজিস্টার, আর সবচেয়ে বেঁটে মানুষটাই আমাদের প্রিন্সিপাল। এসব আমি পরে জেনেছি। ওঁরা সবাই এয়ারফোর্স অফিসার। হেডমাস্টার আর রেজিস্টার স্কোয়াডন লিডার আর প্রিন্সিপাল উইং-কমান্ডার। প্রিন্সিপাল স্যার সেই লম্বা পোডিয়ামের পিছনে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু ইংরেজিতে বললেন। যদিও সেদিন আমি কিছুই বুঝিনি। কিন্তু প্রিন্সিপালের শারীরিক

ভাষা দেখে বুঝেছিলাম যে, কোনো কারণে উনি বেশ বিরক্ত ও রেগে আছেন। পোডিয়ামটা বেশ লম্বা হওয়ার জন্য খাটো মানুষটার মাথাটা খালি দেখা যাচ্ছিল। আর আমরা দূর থেকে তাঁর আস্ফালন দেখছিলাম কিছু না বুঝে। মিনিট পনেরো পরে জাতীয় সংগীত গেয়ে অ্যাসেম্বলি শেষ হল। আমি আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটাকে জিগ্যেস করেছিলাম যে প্রিন্সিপাল কী বললেন। কিন্তু ছেলেটা উত্তর দিয়েছিল, "অত বোঝার দরকার নেই। স্যার খুব রেগে আছেন, গালিগালাজ করলেন।" তারপর সবাই যে যার ক্লাসরুমে চলে গিয়েছিল।

প্রথমদিন আমি ক্লাস ফাইভ 'এ'-তে গিয়ে বসলাম। ওইদিন পড়াশোনার থেকে আলাপচারিতায় বেশি হল। আমাদের ক্লাস টিচার মিস্টার বি কে বোস স্যার এসে নিজেই পরিচয় দিলেন। ওঁর বয়স তখন আন্দাজে আনুমানিক চল্লিশের কোঠায় হবে। সুন্দর ফর্সা, দাড়ি গোঁফ ছাড়া চেহারা। সাদা ফুলপ্যান্ট আর ওপরের সাদা শার্টটা না গুঁজে ওপরে বের করা। মুখে সবসময় একটা অমায়িক হাসি লেগে থাকত। আর প্রতিটা ইংরেজি বাক্যের পরে 'Followed' বলে চলেছেন। ওটা ওঁর মুদ্রাদোষ।

উনি সেদিন সবার নাম ধাম, বাবা কী করেন ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আর ঠাট্টার ছলে নিজস্ব একটা করে নাম দিলেন। সেই নিক নেম আমরা সেদিন পেলাম উপরি হিসেবে যেটা আজ অব্দি অনেকের চালু নাম হিসাবে থেকে গেল। এখনও

পঞ্চাশ বছর পরেও ওই নামেই বন্ধুরা তাঁকে ডাকাতে অভ্যস্ত। এ যেন নাড়ির টান, Like imprinting at critical stage of development!

আমাদের ক্লাসে পাঁচজনের নাম দেবাশীষ ছিল। এ তো মহা মুশকিল! সবার উপাধি আলাদা যদিও কিন্তু দু-জনের আবার একই উপাধি, আবার দু-জনেই একই হাউস। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে তাদের মধ্যে একজন কুচকুচে কালো আর একজন ধবধবে ফর্সা। সুতরাং বোস স্যার একজনকে ব্ল্যাক দেবাশীষ আর অন্য জনকে হোয়াইট দেবাশীষ বানিয়ে দিলেন। সবাই ফুর্তিতে মেনেও নিল। সমস্যা একটার সমাধান তো হল।

বাকি এক দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য লিখত সে হয়ে গেল বামুন ভট্ট। একজন ভৌমিক থেকে ভৌ হল। আর একজন ছিপছিপে শুকনো কাঠের মতো তাকে 'কাষ্ঠো' বলা হল। এ সেই কবি কালিদাসের, "শুষ্ক কাষ্ঠং তিষ্টতে অগ্রে"।

বোস স্যার আমাদের ইংলিশ পড়াতেন। আর অঙ্কের স্যার ছিলেন ঘোষ স্যার। ঘোষ স্যারের বয়স তখন আনুমানিক ষাটের কাছাকাছি হবে বোধহয়। অত বয়স হলে কী হবে যখন হাঁটতেন তখন পুরো লেফট, রাইট করে হাঁটতেন। কিন্তু চলাফেরা করলে বোঝা যেত স্যারের শরীরের অঙ্গগুলো খুব Stiff, flexible নয়। এখন বুঝি স্যারের নিশ্চয় হাড়ে Ankylosis ছিল। ঘোষ স্যার সবসময় ইংরেজিতে কথা বলতেন। স্যার ক্লাস ফাইভে অঙ্ক শেখাতেন। প্রথম প্রথম যখন LCM, HCF শেখাতেন সত্যি বলছি আমি কিছু বুঝতাম না। এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে অব্দি আমার অঙ্ক নিয়ে খুব গর্ব ছিল কিন্তু এখানে এসে কেমন যেন নিজেকে মূর্খ মনে হতে লাগল। তারপর যখন বুঝলাম যে এই LCM, HCF হচ্ছে ল.সা.গু. আর গ.সা.গু. তখন আবার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

প্রথম কয়েকদিন ক্লাস ফাইভ 'এ'-তে বসে খুব খুশিই হয়েছিলাম 'এ' সেকশন পাওয়ার জন্য। এই সেকশনে তখন আমার সদ্যপরিচিত আমাদের রুমের অনেকেই ছিল যারজন্য মনটা ফুর্তিতেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ কয়েকদিন পরে বোস স্যার ক্লাসে বললেন, "আজকে ইংরেজিতে Dictation নেওয়া হবে, তোমরা শুনে লিখবে আর তার রেজাল্টের ওপর এবার সেকশন ভাগ হবে। যারা বেশি নম্বর পাবে তারা সেকশন 'এ'-তে থাকবে আর যারা কম নম্বর পাবে তারা 'বি' সেকশনে যাবে। আমি তো

আকাশ থেকে পড়লাম, Dictation আবার কী? স্যার বললেন ‘শ্রুতিলেখা’। ইংরাজিতে শব্দ বলা হবে আর তার বানানগুলো লিখতে হবে। ওহ! ‘শ্রুতিলেখা’ সে তো কত লিখেছি আগের স্কুলে কিন্তু সেটা বাংলাতে ‘শ্রুতিলেখা’।

আরম্ভ হল Dictation লেখা। একটা একটা করে ইংরেজি শব্দ স্যার বলে চললেন আর ছাত্রেরা সেটা শুনে ইংরেজি তে বানান লিখতে লাগল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সবাই চটপট লিখতে লাগল। আমার পাশেই এক হিন্দিভাষী বন্ধু বসেছিল, সে বেশ পটাপট লিখে শেষ করে দিল। এদিকে আমি বানান লিখব কী! বেশিরভাগ শব্দ আগে শুনিইনি। সেদিন নিজের দুর্বলতা দেখে খুব অসহায় বোধ করছিলাম।

যথাসময়ে যখন সেই Dictation-এর রেজাল্ট দিল, আমার খুব কম নম্বর ছিল বলে ‘বি’ সেকশনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেই শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তার আগে কখনো ‘বি’ সেকশনে বসিনি। কিন্তু পরেরদিন থেকে কয়েকদিনের প্রিয় বন্ধুদের ছেড়ে চলে যেতে হল ‘বি’ সেকশনে। মন না চাইলেও বি সেকশনে বসতে শুরু করলাম।

এখানে সবকিছু ইংরেজিতে। সকাল থেকে রাত অব্দি ইংরেজিতে কথা বলতে হবে, পারলে ঘুমিয়েও স্বপ্নটা ইংরেজিতে দেখতে হবে। আসলে আমি ভর্তি হওয়ার আগে অব্দি জানতামই না যে এই স্কুলটা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। আমি মনে মনে বুঝে

গেলাম এখানে টিকতে হলে ইংরেজি খুব ভালোভাবে শিখতে হবে। আর আমাদের সঙ্গের এক বন্ধু ইংরেজি গ্রামার বই দেখে দেখে, হিন্দি থেকে ইংরেজি তরজমা করে করে রোজ ইংরেজি বোঝা ও বলা শিখতে লাগল।

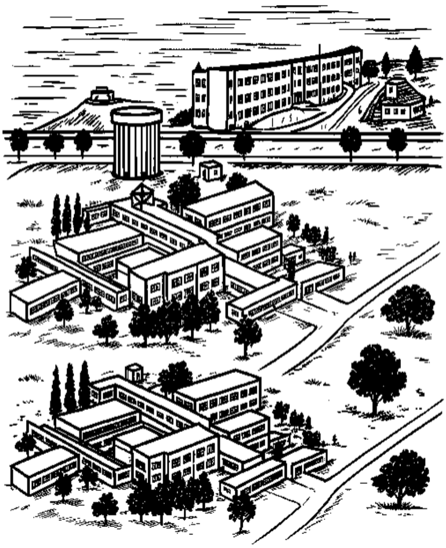

কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলটা আস্তে আস্তে আমার ভালো লাগতে লাগল। আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শব্দগুলো জুড়ে জুড়ে কথা বলতে লাগলাম। স্কুল ক্যাপ্টেনের অর্ডারগুলো বুঝতে লাগলাম যদিও কিন্তু মর্নিং অ্যাসেম্বলির লম্বা লম্বা লেকচারগুলো তখনও মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকল।

এখানে আবার র‍্যাগিং হয়। 'র‍্যাগিং' সেটা আবার কী? ওই সদ্য নতুন ভর্তি হওয়া ছেলেদের সাথে উঁচু ক্লাসের সিনিয়র

দাদাদের পরিচয়-পর্ব। তখন কোনদিন ভালোবেসে গাঁট্টা বা চড়-থাপ্পর আর খেতে হয় তবে অভিযোগ করা যাবে না কর্তৃপক্ষকে। মোটের ওপর এখানে সিনিয়ররা সবসময় সবদিক থেকে সিনিয়র। তাদেরকে সম্মান করতে হবে, ‘দাদা’ বলতে হবে। আর তারা যেটাই বলুক মানতে হবে দরকার হলে অর্ডার পালন করতে হবে। এখানে সিনিয়ররাই ‘মা, বাবা’, ‘মাই-বাপ’।

‘সাবধান-বিশ্রাম-তেজ-চল্’

সৈনিক স্কুলে ঢোকার পরের দিন থেকেই আরম্ভ হল প্যারেড করা। আর সেই প্যারেড আটবছর ধরে করলাম। একই জিনিস বারেবারে করার ফলে সেটা যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিল যারজন্য এই নিয়মানুবর্তিতা, প্যারেড করা এগুলো সব আমাদের মধ্যে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই হাউস অনুযায়ী লাইনে দাঁড়িয়ে প্যারেড করে ক্লাসে যেতাম। আবার অ্যাসেম্বলিতে ক্লাস অনুযায়ী লাইন করে দাঁড়িয়ে আবার প্যারেড করে ক্লাসরুমে ঢুকতাম। ছুটি হওয়ার পর লাইন করে প্যারেড করতে করতে ডাইনিং হলে লাঞ্চ করতে যেতাম।

বিকেলে গেম খেলতে গেলেও প্যারেড করে যাও। বিকেল ফেরত স্নান করে সন্ধের প্রেপে ক্লাসে যাবার সময় আবার হাউস অনুযায়ী প্যারেড করে যাও। এমনকী রাত্রে প্রেপ থেকে ফেরার সময় পেটে ক্ষিদে নিয়ে প্যারেড করে ‘ডাইনিং হলে’ যেতে হত!

১৯৭২-এ ক্লাস ফাইভে ঢোকার পর এই প্যারেড সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমাদেরকে রোজ শেখানো হত আর কিছু অতি উদ্যমী ছেলেরা অবসর সময়ে হোস্টেলে এসে নতুন শেখা প্যারেডের ‘অ,আ,ক,খ’ রেওয়াজ করত। সেইদিনই প্রথম

জানলাম যে আমরা হাঁটলে ডান পা এগোলে বাঁ হাত সামনে আর বাঁ পা এগোলে ডান হাত সামনে মেলতে হয়। এটাই নাকি প্যারেডের ‘তেচ্ছল’-এর নিয়ম। ব্যাক গিয়ার মারতে হলে বলবে, ‘পিছে মূর’। সেই ‘পিছে মূর’ করারও একটা ফর্মুলা শেখানো হল, ‘টি, এল, ভি এইচ’। আস্তে আস্তে শিখে গেলাম ‘ডাইনে মূর, বাঁয়ে মূর, ডাইনে দেখ...ইত্যাদি। শেখার পরে কী আনন্দ। প্যারেড করতে না জানার জন্য আর শাস্তি পেতে হবে না!

সপ্তাহে একদিন সোমবার সকালে দুটো পিরিয়ড আর শুক্রবার বিকেলে আসল প্যারেড হত সেটা ছিল ‘এন.সি.সি.’-তে। সেইদিন বিকেলে গেম খেলা হত না। পরিপাটি ইস্ত্রি করা খাকি ড্রেস, মাথায় টুপি আর পালিশ করা ভারী এন.সি.সি. জুতো পরে যেতে হত। সেই নির্দিষ্ট জুতোটা দেখলেই আমার বুলডগের মুখটাকে মনে পড়ত। তার নীচে আবার পাতলা কঠিন ধাতবের

‘হর্স-শু’ লাগানো থাকত যারফলে ওই জুতো পরে চললে বেশ ‘ঠক ঠক’ শব্দ হত।

শোলে সিনেমার গব্বর সিং-কে মনে আছে তো? গব্বর সিং তার ডেরায় পাথরের ওপরে হাতে বেল্ট নিয়ে হাঁটছে আর সেই বিখ্যাত ডায়লগ মারছে যে, ‘কিত্‌নে আদমী থে?’ সেইসময় জুতোর যে আওয়াজ হয়েছিল ঠিক সেইরকম আওয়াজ করত আমাদের এন.সি.সি.-র জুতোগুলো। আর যে ক্যাপ্টেন থাকত কিংবা ‘স্কুল প্রিফেক্টরা’ সেই জুতোর আওয়াজ দিয়েই অর্ধেক কেল্লা ফতে করে দিত। সেই জুতোর আওয়াজ শুনলেই আমার মতো সাদামাটা জুনিয়র ছেলেরা বুঝতাম পরিবেশ গম্ভীর কিছু অঘটন ঘটাতে চলেছে!

এই এন.সি.সি.-র বেল্টটা একটু অন্যরকম। কোমরে ওপর থেকে জড়িয়ে সামনে দুটো প্রান্তকে আঁকশির মতো লাগিয়ে নিতে হত। বেল্টটা থাকত শক্ত ক্যাম্বিশ জাতীয় খরখরে কাপড়ের আর সামনের আঁকশি দুটো পিতলের। আর টুপি ছিল নেভি ব্লু কিংবা কালো। সামনে একটা লাল পালকের ঝুঁটি যেটাকে বলা হত ‘হ্যাকেল’ অথবা অন্য একধরনের লাল উলের তৈরি ‘পমপম’। এই পমপমটা ঠিক টেবিল টেনিস বলের আকারের। পমপমটা ভালোভাবে টাইট করে না লাগালে একদিকে ঘাড় হেলিয়ে নেতিয়ে যেত আর দেখতেও খারাপ লাগত।

এন.সি.সি.-র সময় আমাদের একজন এন.সি.সি. টিচার থাকতেন আর একজন আর্মির সুবেদার গোটা ‘এন.সি.সি.’ র ইনচার্জ থাকতেন। সেই এন.সি.সি. করার দিনটা সাধারণত বেশ কষ্টকর হত। মাঝেমধ্যে ‘বৈঠ যাও’ বললে সবাই পদ্মাসনে (আসন) টানটান হয়ে বসে যেতাম যতক্ষণ না—‘আরাম সে’ বলতেন সেই সুবেদারজি। তার মানে তখন একটু ঢিলেঢালা হয়ে আরাম করে বসতে পারতাম। তারপর সেই সুবেদারবাবুর হিন্দিতে লেকচার শুরু হত।

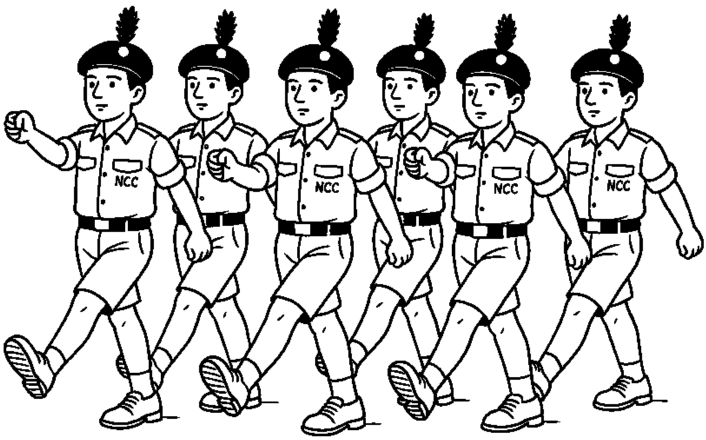

এই ‘এন.সি.সি.’র সময় মাঝে মধ্যে আমাদের সবাইকে প্যারেড করতে করতে স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে অনেক দূরে নিয়ে যেত। সেদিন খুব ফুর্তি লাগত আমাদের। কেন? কেন-না ওই স্কুল ক্যাম্পাসের বেড়াজাল থেকে বাইরে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু সে তো ক্ষণিকের জন্য। তবু বাইরের হাওয়া-বাতাস নেওয়া আর

মাঝখানের ব্রেকে লুকিয়ে কিছু ছোটোখাটো খাবার জিনিস কিনে নেওয়া। সিনিয়র হওয়ার পর ওই সুযোগে সিগারেট কিনে হোস্টেলে আমদানি করাও এটা ছিল মোক্ষম সুযোগ।

তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টা এন.সি.সি. করার পর আমাদেরকে একটা প্যাকেট দেওয়া হত। সেটাতে থাকত সিঙারা, জিলিপি আর আলাদা করে একটা গ্লাসে সরবত। সেগুলো তখন আমাদের কাছে অমৃত সমান! তখন আমরা একে অপরকে জিগ্যেস করতাম, ‘এরপর আবার কবে এন.সি.সি. হবে?

পি.টি. ও ডাইনিং

এখানে সকালে উঠেই এক ঘণ্টা মতো লাইনে দাঁড়িয়ে ‘পি.টি.’ করতে হত সাদা হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে। প্রথমে অনেকটা রাস্তা জগিং করে যেতে হত তারপর হাত পা ছুঁড়ে ব্যায়াম। সে অনেকরকম কসরত এক ঘণ্টা মতো চলত। এইসব তত্ত্বাবধান করত আমাদের স্কুল ক্যাপ্টেন, হাউস ক্যাপ্টেন আর সাথে থাকতেন দু-জন পি.টি. টিচার। তারমধ্যে একজন পি.টি. টিচার ছিলেন সর্দারজি। সাদা হাফ প্যান্ট আর সাদা টি শার্ট পরে সুঠাম চেহারার মানুষ ছিলেন মিস্টার সিং। সারাক্ষণ আমাদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকতেন। ভীষণ কর্মঠ ছিলেন উনি। পরে জানতে পারি ওঁর ছেলে আমাদের ক্লাসে একইসঙ্গে ঢুকেছে। যেহেতু সে টিচারের ছেলে তাই বাড়িতেই থাকে। তাদেরকে ‘ডে স্কলার’ বলা হত। সে আমাদের মতো সবকিছু নিয়মানুযায়ী রুটিনমাফিক কোয়ার্টার থেকে করত।

আর এক পি.টি. টিচার ছিলেন বেশ লম্বা ফুলপ্যান্ট পরা সাধারণত উনি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতেন বেশি। ব্যায়াম কসরত বিশেষ করতেন না। কিন্তু সজাগ দৃষ্টিতে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করে যেতেন। ওঁর গলার আওয়াজ ছিল খুব গম্ভীর,

হুংকার দিলে সবাই ভয়ে কাঁপত। ওঁর আসল নাম যাইহোক আড়ালে অন্য নাম চালু ছিল।

তখন রোজ সকালে উঠে পি.টি. করা মোটেই ভালো লাগত না। কিন্তু আমরা নিরুপায় ছিলাম, যেতেই হত। রোজকার রোল-কলে উপস্থিতি জানাতে হত। পি.টি.-র সময় জামা-প্যান্ট পরিপাটি হতে হবে, সাদা কাপড়ের জুতো (কেডস) পরিষ্কার করে ধুয়ে রং চড়িয়ে আসতে হত। আদবকায়দা ওখানে ছিল ভীষণ কড়া, পান থেকে চুন খসার উপায় নেই।

রবিবার পি.টি. হত না, যারজন্য সকালে একটু বেশি ঘুমানো যেত। আর সকালে বৃষ্টি হলে একটু রক্ষা, বেশি দৌড়োদৌড়ি করতে হত না। যারজন্য সকালে মেঘ দেখলেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম যাতে জোরে বৃষ্টি নামে আর পি.টি. করতে না হয়। কিন্তু সেই কৃত্রিম প্রার্থনার সাড়া খুব কমই মিলত।

পি.টি. করে ঘুরে এসেই ড্রেস পালটে খাকি ড্রেস, লাল চামড়ার বেল্ট যেটার মাঝখানে পিতলের চাকতি সেটাতে স্কুলের এমব্লেম খোদাই করা থাকত। সঙ্গে কালো জুতো পালিশ করে টিপটপ হয়ে যেতে হত। প্রথমে ডাইনিং হলে গিয়ে সকালের ব্রেকফাস্ট করে হাউস অনুযায়ী লাইন করে রোল-কল করে স্কুলের অ্যাসেম্বলি হলে যেতে হত।

প্রথমদিন ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্টের জন্য ঢুকে যে যার নির্দিষ্ট জায়গাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাইনিং হলটা বিরাট বড়ো লম্বা হলঘর। চারটে হাউসের চারটে লম্বা রো যেখানে পরপর খাওয়ার টেবিল সাজানো। আর একটা লম্বা রো কমন বা একস্ট্রা টেবিলের রো। এক-একটা রো তে তেরোটা করে টেবিল আর প্রত্যেকটা টেবিলে ছয়জন করে বসতে পারবে। স্কুল ক্যাপ্টেন হুকুম না করা অব্দি কেউ বসতে পারবে না।

ডাইনিং হলের চারদিকে টেবিলের আশপাশে ইউনিফর্ম পরে ওয়েটাররা ঘুরে বেরাচ্ছে। কিছু দিতে হলে তারাই দেবে। ব্রেকফাস্টে ছয় পিস ব্রেড, এক চামচ বাটার, একটা সেদ্ধ ডিম আর এক কাপ চা। খাবারগুলো একটা চিনেমাটির কোয়ার্টার প্লেটে রাখা আর সাথে একটা চামচ আর বাটার লাগানোর জন্য স্টিলের ছুরি। এসব দেখে তখন মনে হয়েছিল এগুলো যেন ইংরেজি খাওয়া। ছুরি চামচ দিয়ে খেতে হবে সে তো অভাবনীয় ব্যাপার।

এ তো রাজকীয় ব্যাপার-স্যাপার। কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে প্রথম প্রথম ভীষণ অসুবিধা হত। তখন হয় হাত থেকে খাবার পড়ে যেত তা নাহলে চামচ পড়ে যেত। ডিমসিদ্ধ চামচ দিয়ে খাব কীভাবে? পেটে তখন খিদে আর এত কসরত করতে করতে খেতে ভয়ে লজ্জায় ঘেমে যেতাম। তখন আমি এমনিতেই লাজুক ছিলাম আর তার ওপর এই কড়া শাসনের পরিবেশ আমাকে

আরো লাজুক করে দিল। তখন না পারতাম বলতে আর না পারতাম গিলতে।

ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার সময় কয়েকটা টেবিলে স্যারেরাও বসতেন খেতে। আর প্রত্যেকটা টেবিলে সিনিয়র জুনিয়র সবাই মিলিয়ে বসার নিয়ম ছিল। প্রত্যেকজন ছেলের বসার জায়গা স্থায়ীভাবে ফিক্স ছিল যারজন্য রোজ একই সিটে সবাই বসত। সাধারণত সিনিয়াররা টেবিল ম্যানার্স শিখিয়ে দিত। তারপর যত দিন গেল ডাইনিং টেবিলে কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

এখানে আবার সিনিয়র দাদারা ভীষণভাবে "দাদা"। একটু বড়ো মানেই সবাই জ্যাঠামো ফলাত। খাওয়ার টেবিলে কথা না বলে খেতে হবে। একদিকে সিনিয়রের ভয় আর অন্য দিকে কাঁটা চামচ পড়ে যাওয়ার ভয়। এ যেন সেই জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।

ব্রেকফাস্টটা তবে মন্দ হত না। লাঞ্চ মানে দুপুরের খাওয়া দেড়টা নাগাদ হত। সকাল থেকে দেড়টা অব্দি ক্লাস করে ক্লান্ত শরীরে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে লেফট রাইট করতে করতে এসে ডাইনিং হলে ঢুকতে হত।

ডাইনিং হলে ঢুকে যে যার নিজের টেবিলের পেটে ঢোকানো চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াতে হত যতক্ষন না স্কুল

ক্যাপ্টেন বসতে অর্ডার দিত। কোনোদিন যদি ডাইনিং হলে ঢুকতে দেরি হয়েছে আর নিজের টেবিলে পৌঁছানোর আগেই স্কুল ক্যাপ্টেনের চামচ দিয়ে টেবিল ঠোকার শব্দ, 'ঠক, ঠক, ঠক...' তাহলে সেখানেই স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে যেতে হবে যতক্ষন না স্কুল ক্যাপ্টেনের প্লেজ বলা শেষ হচ্ছে। বসার আগে সবাই নিশ্চুপ। সবাই চুপ না করলে স্কুল ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠত, "Don't talk, stop talking." তারপর বসতে বলার প্লেজ বলার পরেই একসাথে সবার চেয়ার টানার শব্দ, 'ঢপ,ঢপ, ঢপ...', তারপরেই কাঁটা চামচের রিনিঝিনি শব্দ। চুপচাপ খেতে হবে। কেউ জোরে শব্দ করতে পারবে না, কেউ জোরে ঢেকুর তুলতে পারবে না। চেয়ার থেকে উঠে খাওয়ার প্লেট টানতে পারবে না। কিছু দরকার হলে পাশের জনকে বলতে হবে, "Can you please pass me the rice." এগুলো সব টেবিল ম্যানার্স।

দুপুরে লাঞ্চে দুটো হাতে গড়া রুটি। থুড়ি চাপাটি। রুটিকে যে চাপাটি বলতে হয় এখানে এসে শিখেছিলাম। চিনে মাটির প্লেটে দুই ঢিপি ভাত। আসলে এক সাইজের স্টিলের বাটি দিয়ে দুই বাটি ভাত রেখে দেওয়া হত। একটা সাধারণ সিজন অনুযায়ী নিরামিষ তরকারি। আর একটা স্টিলের বাটিতে এক পিস কাটা মাছ-সহ আলু ছাড়া মাছের ঝোল। সবসময় কাতলা বা রুই মাছ দেওয়া হত। খাওয়ার জন্য তিরিশ মিনিট মতো সময় পাওয়া যেত খাওয়ার। তারপর আবার সেই স্কুল

ক্যাপ্টেনের অর্ডার হলে প্লেজ বলার পর সবাই উঠে দাঁড়াত আর চেয়ারগুলো টেবিলের পেটের ভিতরে ঠেলে দিত। তখন আবার এক বিকট আওয়াজ হত চেয়ারের। তারপর হাত ধুয়ে যে যার রুমে গিয়ে বিশ্রাম।

একইরকম রাত্রের খাওয়া। ওখানেই প্রথম শিখলাম যে রাতের খাওয়াকে ‘ডিনার’ বলা হয়। ডিনারে সেই দুটো রুটি, ভাত, ডাল, দুই রকমের তরকারি। আর ছোটো প্লেটে কোনো মিষ্টি আইটেম। সাধারণত কাস্টার্ড কিংবা সুজির পায়েস অথবা শুকনো বোঁদে এইসব দেওয়া হত। এটাকে সুইট ডিস বা ডেসার্ট বলা হত। এ যেন সেই, “মধুরেন সমাপেত”। রাত্রের খাওয়া

যেমনই হোক সবার নজর ও লোভ থাকত ওই সুইট ডিসের দিকে। তারমধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় ছিল শুকনো বোঁদে। সেই বোঁদে বৃহস্পতিবার ডিনারে দেওয়া হত। কিন্তু অত অল্প বোঁদে খেয়ে কারও পোষাত না। মনে হত আরো খাই। তখন মাঝে মাঝে ভাবতাম ছুটিতে বাড়ি গেলে পেটভরে বোঁদে খাব। সত্যিকরে খাওয়া হয়েছিল কি না মনে নেই কিন্তু শুকনো বোঁদের প্রতি লোভটা থেকে গিয়েছিল।

স্কুল ক্যাম্পাস

আমাদের সৈনিক স্কুলের ক্যাম্পাসটা ছিল বিরাট বড়ো। আয়তনে তিন-শো চোদ্দো একরের কাছাকাছি। চারিদিকের বাউন্ডারি তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা কিন্তু আমাদের থাকার হোস্টেল থেকে এতদূরে যে বাউন্ডারি দেখা যেত না। রাঁচি রোড হাইওয়ের পাশেই সৈনিক স্কুলের মেইন গেট। সেই গেটে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা ছিল ‘সৈনিক স্কুল পুরুলিয়া’। গেটটা সবসময় বন্ধই থাকত আর পাশে একটা ছোটো গেট ছিল সেটা দিয়েই লোকজন যাওয়া-আসা করত। স্কুলের ছাত্রদের গেটের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। গেটের পাশেই একটা ছোট্ট রুম ছিল যেটা গার্ড রুম। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা খাকি পোশাকে গার্ড থাকত। সেই রুমেই থাকত সাইরেন বাজানোর সুইচটা। সকাল থেকেই আমাদের স্কুলে অনেকবার সাইরেন বাজত। আমরা সেই সাইরেন শুনেই প্রত্যেকটা কাজ নিয়মমাফিক মেনে করতাম।

গেট থেকে পাকা পিচ দেওয়া দুটো রাস্তা পাশাপাশি সোজা চলে গেছে স্কুলের শেষপ্রান্ত অব্দি। দুটো রাস্তার মাঝ বরাবর পরপর লাগানো অনেক বাগানভেলিয়া গাছ ইঁট দিয়ে ঘিরে জাফরি করা। ইঁটগুলো লাল রং করা আর ওপরের বর্ডারটা সাদা রং করা। রাস্তার দু-পাশে লম্বা ড্রেন শেষপ্রান্ত অব্দি চলে

গেছে। গেট থেকে ঢুকেই ডানদিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা যেখানে পরে Obstacle খেলার দশ ফুট উঁচু দেওয়াল বানানো হয়। আর একটু এগোলেই ডানদিকে বড়ো বড়ো গাছ দিয়ে ঘেরা উঁচু পার থাকা পুকুর। তার পাশেই খোলা ধু-ধু মাঠ সীমানা অব্দি ছড়ানো। আর একটু এগোলেই ডানহাতে একটা রাস্তা চলে গেছে যেখানে হেডমাস্টার, রেজিস্টারের আর একটু দূরে সহকারী হেডমাস্টারের কোয়ার্টার। ঠিক তার সামনেই ডাইনিং হলের পিছন দরজাটা যেদিক দিয়ে ডাইনিং হলের রসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা হত। কিন্তু আমাদের সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া মানা ছিল।

রাস্তাটা দিয়ে আর একটু এগোলেই ডান হাতের রাস্তা দিয়ে আমাদের চারটে পরপর তিনতলা হোস্টেল। আর প্রত্যেকটা ফ্লোরে তিনটে করে হলঘরের মতো বড়ো বড়ো রুম যেখানে আমরা থাকতাম। হাউসগুলোর নাম প্যাটেল, টেগোর, তিলক ও

চিত্তরঞ্জন হাউস ক্রমান্বয়ে। ঠিক টেগোর হাউসের সামনেই বিরাট একতলা ডাইনিং হল। হোস্টেলের সামনের এই জায়গাটা আমাদের খুব মনে থাকবে কেন-না এই জায়গাটা আমাদের বেশিরভাগ সুখ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে আছে।

টেগোর আর প্যাটেল হোস্টেলের পিছনেই একটা ঘেরা জলের পাম্পসেটের জায়গা যেটা কাজে লাগত গরমের সময়। প্রখর গরমে যখন কোনো হোস্টেলে জল থাকত না তখন বিকেলে স্নান করার জন্য ওখানে পাম্প চালিয়ে জল ছাড়া হত। আর অন্য সময় সেটা বন্ধই থাকত অকেজো হয়ে।

সেই জায়গাটা পার হলেই অনেকটা নীচু জায়গায় হকি ফিল্ড। ফিল্ডটা খুব রুক্ষ ছিল, একটুকুও ঘাসের চিহ্ন ছিল না। এখানেই হকি খেলা হত আর পড়ে গেলে হাত পা ছড়ে যেত।

হকি ফিল্ড পার হলেই টিচার্স কোয়ার্টার। টিচার্স কোয়ার্টার ছিল পরপর দুই সারিতে কিছু একতলা আর কিছু তিনতলা ফ্ল্যাট টাইপের।

টিচার্স কোয়ার্টার পার হলেই কয়েকটা ছোটো ছোটো একতলা স্টাফ কোয়ার্টার যেটার একটাতে আমাদের হাসপাতালের স্টাফ গোপালদা থাকত।

সেটা পার হলেই ধোবি কোয়ার্টার। সেটা তিনতলার দুটো ব্লক ছিল যেখানে স্কুলের ধোবিরা থাকত। তার উলটোদিকেই

আবার একটা তিনতলার স্টাফ কোয়ার্টার ছিল। ধোবি কোয়ার্টারের পরেই খালি মাঠ তারপরেই শেষ সীমানা।

এবার মেইন গেটে ঢুকেই রাস্তার বামদিকে অল্প জঙ্গলের মতো তারপরের রাস্তাটাই চলে গেছে প্রিন্সিপালের বাংলোর দিকে। বাংলোটা বাইরে থেকে বিরাট বড়ো লাগত আর চারধারে আম গাছ, পেয়ারা গাছ ভর্তি। যথারীতি ওই জায়গাটা আমাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। কিন্তু নিষিদ্ধ হলে কী হবে আম পেয়ারার জন্য দুপুর বা রাত্রিবেলা সেই জায়গার হাতছানি এড়ানো যেত না। গরমের দিনে কাঁচা আম চুরি করেই সদ্ব্যবহার করা হত। অনেক আম গাছের মধ্যে একটা ছিল কাঁচামিঠা আম। যারা ওই গাছটা চিনত তারা ঠিক গাছে উঠে লক্ষ্যভেদ করত। যারজন্য বাইরে থেকে বাংলোটা দেখা যেত না। রাস্তার বামদিকে পরের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে মেইন স্কুল বিল্ডিঙে যেটাকে বলা হত ‘আডমিনিট্রিটিভ বিল্ডিং’।

আর একটু এগিয়ে গেলেই স্কুলের অ্যাসেম্বলি হলের পিছনটা যেই রাস্তা দিয়ে আমরা রোজ দুপুরে স্কুলের পরে প্যারেড করতে করতে ডাইনিং হলে যেতাম।

সেটা পার হলেই রাস্তার বামদিকে স্কুল বিল্ডিঙের শেষ প্রান্তের মিল্কব্রেক হওয়া জায়গার পিছনটা। সেটা ছিল স্কুল থেকে হোস্টেল যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা। ঠিক সেখানেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে লম্বা জলের ট্যাঙ্ক। যখন ছোটো ছিলাম সেই জলের ট্যাঙ্কটা

দেখার জন্য ঘাড় বাঁকা হয়ে যেত। ভীষণ লম্বা ট্যাঙ্কটা দেখলে কৌতূহল হত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাওয়ার জন্য। সিঁড়ির রাস্তাটা সবসময় তালা মারাই থাকত। জলের মিস্ত্রি ওঠার সময় সেই তালা খোলা হত। একবার ফাঁক পেয়ে ওপর অব্দি উঠে গিয়েছিলাম ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। এক-শো-র ওপর সিঁড়ি ছিল। সিঁড়িটা ভীষণ নোংরা হয়েছিল, পাখি ঢুকে নোংরা করত বোধহয়। ট্যাঙ্কের ওপরে ওঠার পর গোটা স্কুলটা দেখা যাচ্ছিল। ঠিক যেইরকম প্লেন থেকে নীচটা দেখা যায়। খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে আর সঙ্গে লাগছিল রোমাঞ্চকর গা ছমছম ভাব।

সেই ট্যাঙ্কি পার হলেই বাস্কেটবল, ভলিবল, বক্সিং রিঙের জায়গা। তারপরেই বামদিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা ধরে একটু গেলেই বামদিকে গেমস্ স্টোর, কোয়ার্টার মাস্টার স্টোর আর একটু এগোলেই ডানদিকে তিন চারটে ছোটো ছোটো একতলার স্টাফ কোয়ার্টার। যেখানে থাকত আমাদের মেস ম্যানেজার, পি.টি. ইনস্ট্রাকটার, স্কুল বাস ড্রাইভার, কোয়ার্টার মাস্টার।

বামহাতে রাস্তার দুই পাশে লম্বা লম্বা ইউক্যালিপ্টাস গাছ সেটার পাশেই আমাদের ছোট্ট হাসপাতাল। হাসপাতালের সামনে অনেকটা খালি জায়গা। যেটা পার হলেই মেইন চারকোনা (Quadrangular field) মাঠ। সেই মাঠটাতে কোনদিন ঘাস গজাতে দেখিনি, মাটিটা সবসময় রূক্ষ। এই জায়গাটাতেই

আমাদের সব প্রোগ্রাম হত। যেমন স্বাধীনতা দিবস, গনতন্ত্র দিবসের মার্চপাস্ট, স্পোর্টস মিট, NCC, ইত্যাদি সব এই ফিল্ডেই হত। এই ফিল্ডটার আরো বামদিকে জমিটা খাড়া অনেকটা নেমে গেছে যেখানে খালি ব্যবহার না হওয়া খালি মাঠ যেটা গিয়ে ঠেকেছে বাউন্ডারির তার কাঁটাতে।

মেইন রাস্তা ধরে আর একটু এগোলেই বামদিকে চারকোনা (Quadrangular field) মাঠ পার হলেই Mangrove...উঁচু-নীচু মাটিটা আর মাঝে মাঝে লম্বা নাম না জানা গাছ। এই জায়গাতেই ফাল্গুন মাসে ফাগুয়া খেলার পর মজলিস বসত। সেখান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই একটা ফুটবল খেলার মাঠ তারপরেই স্টাফ কোয়ার্টার যেটা আগেই উল্লেখ করেছি।

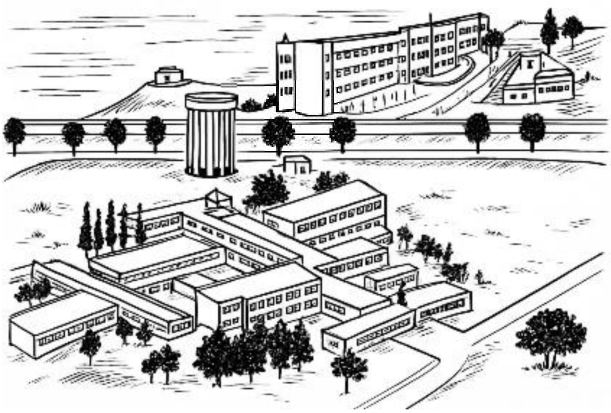

মেইন রাস্তাটা ধোবি কোয়ার্টারের পরে একটু গিয়ে শেষ হয়ে গোলাকার আকৃতি নেয়। তারপরে বামদিকে মাঠের পর মাঠ

আর ডানদিকে বিশেষ কিছু নেই। সেই মাঠ পেরিয়ে একটু গেলেই বাউন্ডারি সংলগ্ন একটা ছোট্ট শিব মন্দির। শিব মন্দির পার হয়ে গেলেই মাঠের পর মাঠ আর শেষ কিনারায় একটা পাড় না থাকা বিরাট পুকুর। সেই পুকুরে সবসময় পদ্মফুল ফুটে থাকত যারজন্য সেটাকে সবাই পদ্মপুকুর বা লোটাস পন্ড বলতাম। এই জায়গাটা খুব রোমান্টিক ছিল। এমনিতেই জায়গাটা নিরালা নির্জন যারজন্য সেই পদ্মপুকুরের পাশে কৈশোরকালে সুখে দুখে বসতে খুব ভালো লাগত। কিন্তু সন্ধে নামলেই গা ছমছম করত। রাত্রে তো পদ্মপুকুরের আশপাশে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না।

সেই পদ্মপুকুর পার হওয়ার পর মাঠ পেরোলেই পিছন দিকের শেষ সীমানা যেটা পার হলে গ্রাম শুরু হয়েছে। সেদিকে যাওয়া আমাদের বারণ ছিল। তাই বলে কি যেতাম না? সে গল্প পরে হবে।

স্কুলের হাসপাতাল

আমাদের স্কুলের হাসপাতালটা ছিল ঠিক আমাদের হোস্টেল প্যাটেল হাউস ও মেইন খেলার ফিল্ডের মাঝখানে একটু উত্তর দিকে। হাসপাতালে যাওয়ার একটা পাকা পাথরের চিপস ফেলা রাস্তা ছিল যার দুই পাশে গাছের সারি। রাস্তার পাশে কয়েকটা ইঁট দিয়ে চার ফুটের জাফরি বানানো আর দুইদিকে লম্বা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ। সামনেই কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে মেইন বিল্ডিঙে ঢুকে যেতে হবে। ঢোকার পরেই খোলা জায়গা তার ডানদিকে আমাদের 'এম.আই. রুম' মানে 'আউটডোর'। সেটা বেশ বড়ো একটা ঘর যেটার ডানদিকে টেবিলে পার্ট টাইম ডাক্তারবাবু বসতেন সপ্তাহে তিনদিন দুপুর আড়াইটা থেকে চারটে অব্দি। এই ঘরের বাইরে সবাই লাইন করে একটা হাতে লেখা স্লিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত রোগ দেখানোর জন্য। ঘরের ভিতরে ফার্মাসিস্ট বিশ্বাসবাবু ডাক্তারবাবুর সামনে নার্ভাস হয়ে ঘামতেন আর স্থূল শরীর নিয়ে এপাশে ওপাশে দৌড়াদৌড়ি করতেন। কেন-না ডাক্তারবাবু ওঁকে খুব একটা ভরসা করতেন না। মানে ফার্মাসিস্ট বিশ্বাসবাবুকে সবাই খুব একটা বিশ্বাস করত না। ডাক্তারবাবুও সবকিছুতেই 'গোপাল' বলে গোপালদাকে ডাকতেন। ডাক্তারবাবু টেবিলে একটা মোটা লম্বা খাতা নিয়ে বসে

রোগের নাম লিখতেন আর আমাদের হাতে ধরা ছোট্ট স্লিপটাতে ওষুধের নাম লিখে দিতেন।

ওষুধ মানে সেই যুগের 'পেনিসিলিন', 'সালফাডাইজিন' কিংবা 'এন্টেরোকুইনল'। 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়'!

কাটা ছেঁড়া হলে গোপালদাই ড্রেসিং করে দিত। হাত ভাঙলে ওখানেই প্লাস্টার করে দিতেন ডাক্তারবাবু। হাত-পা মচকে গেলে একটা 'ক্রেপ ব্যান্ডেজ' জড়িয়ে দেওয়া হত। আমাদের মতো কিছু ছেলেরা যেত ঠিকই রোগ দেখাতে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য থাকত রোগের ভান করে হয় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, তা নাহলে কিছুদিনের জন্য 'ই.পি.' স্লিপ নেওয়া। এই ই.পি. স্লিপ পেলে পি.টি. ও প্যারেড করা থেকে নির্দিষ্ট দিন ক-টা রেহাই পাওয়া যেত।

আর ভাগ্য ভালো হলে হাতে যদি 'ক্রেপ ব্যান্ডেজ' লাগানো গেল তাহলে তো কেল্লা ফতে! বেশ কয়েক সপ্তাহ ক্লাসে লেখালেখি করতে হত না। আর আমাদের ক্লাসের গৌর গোপালের হাতে প্রায়ই 'ক্রেপ ব্যান্ডেজ' দেখা যেত।

ওই রুমে একটা ওজন করার মেশিন থাকত আর হাইট মাপার যন্ত্র। কয়েকমাস পরপর আমাদেরকে ক্লাস অনুযায়ী আসতে হত রুটিন মেডিক্যাল চেকআপ করানোর জন্য। সেদিন ওজন ও হাইট আর বুকের (ছাতির) সাইজ লিখে নেওয়া হত।

তখনকার দিনে চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে চুলকালে ওটাকে ‘জয় বাংলা’ বলা হত। এখন আমরা ওটাকেই ‘কন্‌জাটিভাইটিস’ বলি। সেই ‘জয় বাংলা’ হলে অনেকে ডাক্তারবাবুর থেকে কয়েকদিনের জন্য কালো চশমা পরার অনুমতি পেত। একবার গরমের ছুটির পর আমরা যখন স্কুলে ফিরলাম তখন আমাদের ক্লাসের টেগোর হাউসের পার্থ চোখে কালো চশমা পরে এল চোখে অসুখ হয়েছে বলে। তারপর সেই কালো চশমা পরে ক্লাস করতে লাগল দিনের-পর-দিন। কিন্তু সে ছিল খুব ঘুমকাতুরে সুতরাং ক্লাস চলাকালীন সেই কালো চশমা পরে তার ঘুমাতে বেশ সুবিধাই হল। সে ক্লাস চলাকালীন ঘাড়টা সোজা রেখে আরামে ঘুমায়। কালো চশমার সেই মহিমা বোঝার পরে সে আর কালো চশমা খুলতে চায় না!

হাসপাতালের ঠিক সেই এম.আই. রুমের উলটোদিকে একটা খোলা জায়গা ছিল যেটার সামনে কালো স্ল্যাব দিয়ে উঁচু করে ঘিরে একটা খোলা রুম বানানো ছিল। একপাশে ছিল ঘরটায় ঢোকার রাস্তা। এই জায়গাটাতে ড্রেসিং, প্লাস্টার ইত্যাদি করা হত। ঠিক তার সংলগ্ন একটা টয়েলেটও ছিল।

এবার ওই ড্রেসিং রুমের পাশ দিয়ে গেলেই বাঁ দিকে লম্বা করিডোর আর তার ভিতরে লম্বা হলঘরে ইনডোরের ব্যবস্থা। সেখানে প্রথম রুমটা ছিল খাওয়ায় ঘর মানে প্যান্ট্রি।

আর হলঘরের দুইদিকে বিছানা পাতা রোগীদের জন্য। মনে হয় বারো বা চোদ্দোটা মতো বিছানা থাকত।

এবার হাসপাতালে ঢুকেই ডানহাতে ডাক্তারবাবুর রোগী দেখার রুম আর ঢুকেই নাক বরাবর একটা করিডোর যার ডানপাশে পরপর চারটে ছোটো সাইজের রুম। প্রথম তিনটে 'আইসোলেশান রুম' মানে হাম, বসন্ত কিংবা মাম্পস ইত্যাদি হলে ওই রুমে রোগীদেরকে রাখা হত। বেশিরভাগ সময় এই রুমগুলো বন্ধ অবস্থাতেই পড়ে থাকত কেউ থাকত না বলে। আর সেই করিডোরের লাস্ট রুমটা ছিল ফার্মাসিস্ট থাকার রুম। উনি চিরকাল একাই থাকতেন আর আমাদের ডাইনিং হলেই খাওয়া দাওয়া করতেন। এইদিকের করিডোরটা ছিল খুব নির্জন। করিডোরের পাশে চার ফুটের দেওয়াল পার হলেই বড়ো বড়ো গাছপালার জঙ্গল। সাধারণত এদিকে আমরা খুব একটা যেতাম না যেহেতু ওইদিকে ফার্মাসিস্টের কোয়ার্টার ছিল।

আমাদের হাসপাতালে সপ্তাহে তিনদিন ডাক্তারবাবু আসতেন একটা ক্রিম রঙের এম্বাসেডার গাড়িতে করে ঠিক দুপুর আড়াইটে নাগাদ। ওঁর নাম ছিল মনে হয় ডা. সুকুমার মুখার্জি। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখলেই ডাক্তার ডাক্তার মনে হত। দুপুরে লাঞ্চের পর দূর থেকে ওঁর গাড়ি দেখলেই বুঝতাম ডাক্তারবাবু হাসপাতালে আছেন। ওই সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় ফার্মাসিস্ট ও গোপালদা রোগী দেখার কাজ চালিয়ে নিত। তাই বলে কি

রাতবিরেতে ইমারজেন্সি হত না? নিশ্চয় হত তখন স্কুল বাসে করে পুরুলিয়া টাউনে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত। আবার কারো কোনো জটিল রোগ কিংবা রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে ইত্যাদি করতে হলে দিনের বেলায় স্কুল বাসে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত। আর টাউনে যাওয়া মানেই 'খোলা গোরু', সুযোগ পেলেই কিছু ছোটোখাটো খাবার জিনিস কিনে নিয়ে আসা।

তখনকার দিনে ডাক্তারবাবু একটা টনিক লিখে দিতেন 'মিনবেরিজ' একদম ভেলি গুড়ের মতো দেখতে ও খেতে। ওটা কেউ নিয়ে এলে সবাই এক চুমুক করে খেয়ে একদিনেই শেষ করে দিত। কাশির ওষুধ ছিল 'ওয়াটার বেরিজ কম্পাউন্ড' আর 'বেনাড্রিল', ওটাও খেতে বেশ ভালো লাগত কিন্তু ঘুম পেত।

আর একটা মজার জিনিস ছিল ডাক্তারবাবু যদি ডায়াগনোসিসে 'ম্যালনিউট্রেশন' লিখে দিতেন তাহলে ডাইনিং টেবিলে রোজ অতিরিক্ত স্পেশাল খাবার পাওয়া যেত, যেমন একস্ট্রা ডিম ইত্যাদি। সেই লোভে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন আমার 'ম্যালনিউট্রেশন' হয়ে যায় তাহলে একস্ট্রা প্রোটিন খেতে পাব! কিন্তু গোটা স্কুল জীবনে আমার ভাগ্য খুলল না। ওই বয়সে একটা একস্ট্রা সেদ্ধ ডিম খাওয়ায় জন্য হাপিত্যেশ করতাম আর এখন আমাদের ছেলে-মেয়েরা ডিম দিলে খেতে চায় না!

সাধারণত হাসপাতালে কেউ ভর্তি হতে চাইত না। ভর্তি হলে তাকে হাসপাতালে একাকী সিনিয়র বা জুনিয়রদের সঙ্গে থাকতে হবে বলে। কিন্তু একবার ভর্তি হলে খাওয়া-দাওয়াটা মন্দ হত না। ঠিক নির্দিষ্ট খাওয়ার সময়ের আগেই মেসের হেমু কোমর নাচাতে নাচাতে মাথায় করে মেস থেকে খাবার নিয়ে চলে আসত।

ক্লাস ইলেভেন বা টুয়েলভে একবার বেশি অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হলাম দুই বন্ধু তারপর সন্ধের সময় বিছানায় মশারি টাঙিয়ে পালিয়ে গেলাম টাউনে সিনেমা দেখতে। রাত্রে ফিরে এসে করিডোর টপকে দরজা খুলে বিছানায় সেঁদিয়ে গেলাম। ফার্মাসিস্ট বুঝতেও পারল না। আসলে হাসপাতালে যেহেতু রোল-কল হত না যারফলে পালানোটা সোজা ছিল।

বর্তমানে আমি একটা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর ও হেড, আমার তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশটা ইনডোর বেড। এখানে আমার ইমেজ ভীষণ কড়া শাসনের স্যার। মাঝে মাঝে ভাবি ভাগ্য ভালো যে আমার অতীতের স্কুল জীবনের এইসব দুঃসাহসিক অভিযানগুলো এখানে কেউ জানে না।

পানিশমেন্ট-শাস্তি

‘আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন—

আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন॥

যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা

যায় আপন কুলায়-মাঝে,...’

—শাস্তি কতরকমের হয়?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর সত্যিই কারো জানা নেই। শাস্তির রকমভেদ আছে কিন্তু ঠিক কত রকমের সেটা বলা মুশকিল।

সৈনিক স্কুলে প্রথম ঢোকার পর বেশ কিছু অদ্ভুত সব শব্দ শিখলাম যেগুলো আগে কোনদিন শুনিনি। শুনবই-বা কী করে তখন বয়স তো সবে দশ। হাফপ্যান্ট পরে সবে পৃথিবীটাকে দেখছি।

একটা শব্দ হল’ ‘ক্যালাস’; একটু ঢিলেমি দেখলেই ‘ক্যালাস’ বলা হত। সেই শব্দের ব্যবহার এত বেশি হতে লেগেছিল যে এটা একটা গালিগালাজের পর্যায়ে নেমে এসেছিল।

দ্বিতীয় শব্দটা হল’ ‘স্মার্ট’ আর তৃতীয়টা যথারীতি, ‘ওভারস্মার্ট’! একটা ভালো আর পরেরটা মন্দ।

চতুর্থ শব্দ হল’ ‘র‍্যাগিং’ আর পঞ্চম শব্দ ‘পানিশমেন্ট’। এই র‍্যাগিং’ ও ‘পানিশমেন্ট’ ঠিক যমজ ভাইয়ের মতো হাতে হাত ধরে চলে যারফলে স্কুলে ঢোকার পরেই এই দুটো শব্দের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।

এখানে অলিখিত নিয়ম ছিল সিনিয়ররা ‘র‍্যাগিং’ করবে ও ‘পানিশমেন্ট’ দেবে আর জুনিয়রদের সেটা মাথা পেতে নিতে হবে। স্কুলে এক ক্লাস সিনিয়রদের নাম দিয়ে ডাকা যেত ও ‘তুই’ সম্বোধন করার অলিখিত নিয়ম ছিল। কিন্তু এক ক্লাসের বেশি সিনিয়র হলে ‘দাদা’ ডাকতে হত ও ‘তুমি’ সম্বোধন করতে হত।

সৈনিক স্কুলে কত যে হরেকরকমের শাস্তি পেয়েছি তার হিসাব নেই কিন্তু সেই শাস্তি খেয়ে বিশেষ করে কেউ মনে রাখেনি। উলটে শাস্তিটা নিতে পেরে বা সহ্য করতে পেরে গর্বে বুক ফুলে উঠত। দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে খালি ‘কানমলা’ টাকে শাস্তি বলে ভেবে এসেছিলাম কিন্তু এই সৈনিক স্কুলে এসে দেখলাম এই ‘কানমলা’ হচ্ছে জলভাত!

এখানে সবচেয়ে কমন শাস্তি ছিল ‘নিল-ডাউন’ আর কানধরে ‘নিল-ডাউন’। সিনিয়রদের চড়, থাপ্পড়, লাথি, বেল্টটাকে চাবুক হিসেবে ব্যবহার করা এগুলো ছিল ‘কর্পোরাল পানিশমেন্ট’।

একদিন প্রচণ্ড গরমে তাও আবার পুরুলিয়ার গরম! আমাদের খটখটে শুকনো হকি মাঠে মানে যেখানে কোন ঘাস দেখা যেত না সেখানে ‘নিল-ডাউন’ হয়ে হাঁটতে হল। আমরাও বেশ মজা করে হাঁটতে লাগলাম। ‘দশে মিলি করি কাজ নাহি জিতি নাহি লাজ’ সুতরাং পানিসমেন্ট বা শাস্তিটা খুব উপভোগ করলাম।

একবার পানিসমেন্ট দেওয়া হল দৌড়ে গিয়ে একটা গোরুকে ঘুরে একপাক দিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে কিন্তু যেই দৌড়ে গোরুর কাছে আমরা গিয়েছি গোরু ভয়ে লেজ গুটিয়ে মারল দৌড়। এদিকে আমরাও মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছি আর গোরু ব্যাটা আরও মরিয়া হয়ে পালাচ্ছে। কোনোমতে সেদিন সেই যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু আজও সেটা মনে থেকে গেছে। উপরন্তু উপরি হিসাবে পেয়েছি আনন্দ!

পি.টি. বা এন.সি.সি.-তে ক্রলিং করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু সেই ক্রলিং করার পরে হাতের পিছনে ও হাঁটুতে রক্ত বের হত। আর নিজেকে স্মার্ট দেখানোর জন্য আমরা হাসতাম।

একবার কী হল আমরা কয়েকজন শাস্তি পেলাম যে নিলডাউন হয়ে হাঁটতে হবে যতক্ষণ না হাঁটু থেকে রক্ত বের হয়। ব্যাস, আমাদের হাঁটা আরম্ভ হয়ে গেল কিন্তু হাঁটুর থেকে রক্ত আর বের হয় না। তখন আমাদের এক বন্ধুর হাঁটু থেকে রক্ত

বের হচ্ছিল। আমরা কয়েকজন তার থেকে রক্ত ধার নিয়ে নিজের হাঁটুতে মাখিয়ে নিলাম। এবার কেল্লাফতে! সেখানেই শাস্তি শেষ হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে আমাদের চুলটা বড়ো দেখলে কিংবা প্যারেডে কোনো গড়বড় করলে পানিসমেন্ট দেওয়া হত চুলের ‘বাটি ছাঁট’। প্রিয় চুলগুলোকে ফেলে দিতে খুব দুঃখ হত ঠিকই কিন্তু সেই বাটি ছাঁট নেওয়ার পর অনুভব করতাম কানের পাশ দিয়ে হাওয়া বয়ে যাওয়ার অনুভূতি যেটা এক আলাদা আনন্দ দিত। মনটা তখন আনন্দে ফুরফুরে লাগত!

ক্লাস এইটে কয়েকজন আমাদের ক্লাসের বন্ধু শনিবার রাত্রে টাউনে গিয়ে ‘কালাসোনা’ সিনেমা দেখে এল। পরেরদিন রবিবার ছিল সিনিয়র দাদারা সেই টাউন পালানোর খবর পেয়ে ব্রেকফাস্টের পর সেই ছয়জন আসামিকে তলব করল। তারপর বেধরক মারল। এন.সি.সি.-র বেল্ট দিয়ে খুব পেটালো কিন্তু ভাগ্য ভালো যে প্রিন্সিপালকে রিপোর্ট করল না। সেই পানিসমেন্ট খেয়ে বন্ধুরা খুশি মনে আমাদেরকে আগেরদিনের সিনেমা ‘কালাসোনা’-র গল্প বলতে লাগল।

একবার ক্লাসে একজন ঘুমোচ্ছিল তখন ক্লাসের স্যার তাকে ঘুমোতে দেখে পানিসমেন্ট দিল যে ক্লাসের বাইরে নিলডাউন হয়ে থাকতে হবে। সে সেই শাস্তির অর্ডার পালন

করল ঠিকই কিন্তু বাইরে নিলডাউন হয়ে আবার ঘুমোতে লাগল আর আমরা সেটা দেখে হেসে লুটোপুটি।

তারমানে শাস্তি বা পানিসমেন্ট যখন কষ্ট বা দুঃখ দেয় না তখন সত্যিই কি সেই পানিসমেন্ট শাস্তি হয়ে থাকে? নিশ্চয়ই না। তখন সেটা পুরস্কার হয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় 'নেগেটিভ রি-এনফোর্সমেন্ট' 'পজিটিভ রি-এনফোর্সমেন্ট' হয়ে যায়।

আমাদের সৈনিক স্কুলের ছেলেবেলা সত্যিই খুব মজার ছিল। আমরা অনেক হরেকরকম পানিসমেন্ট ও শাস্তি খেয়েছি ঠিকই কিন্তু সেটা খুব উপভোগ করেছি। যারফলে যখন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম তখন রাগিঙের পানিসমেন্টগুলো কিছু মনে হত না। সেইসব ছিল আমাদের সৈনিক স্কুলের পানিসমেন্টের তুলনায় একেবারে নস্যি।

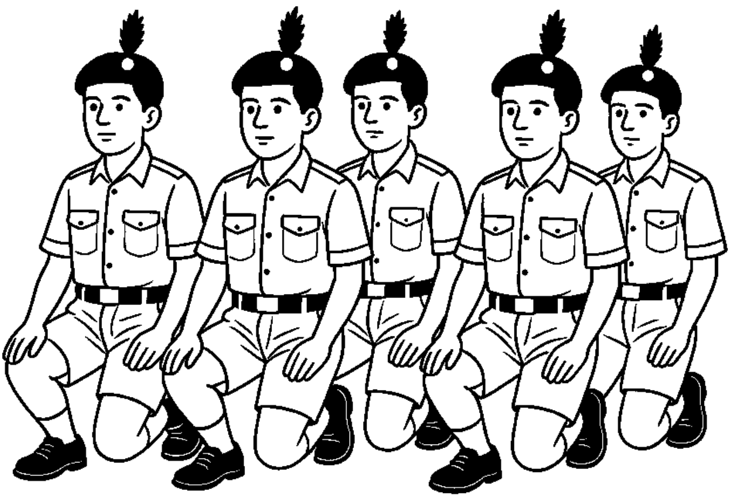

এইজন্যই এই লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, ‘আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে...’ কিন্তু শেষপর্যায়ে এসে উপলব্ধি করলাম যে আমরা স্কুলে শাস্তিটা কে মনে-প্রাণে এনজয় করেছি। তাই শেষ পঙ্‌ক্তিতে উদ্ধৃতি পালটাতে বাধ্য হলাম।

‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,

দিনরজনী কত অমৃতরস

উথলি যায় অনন্ত গগনে॥

পান করি রবে শশী অঞ্জলি ভরিয়া—’

জুতো পালিশ

সৈনিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম থেকেই কয়েকটা জিনিস বুঝে গিয়েছিলাম। যেমন, নিয়মানুবর্তিতা, ঠিক সময়ে নিয়মানুযায়ী সঠিক ড্রেস পরা আর জুতো অপরিষ্কার হলে চলবে না। জুতো পরিষ্কার ও চকচকে হতে হবে। জুতো চকচকে না হলে শাস্তি খেতে হবে। ওই দশ বছর বয়স থেকেই মানে ক্লাস ফাইভে ঢোকার পরের থেকেই আমাদের অনেকগুলো জুতোর সেট ম্যানেজ করতে হত। যেমন, কালো জুতো, কাপড়ের সাদা কেডস্ জুতো, এন.সি.সি-র সময় আলাদা ভারী জুতো। আবার তারপরেও ফুটবল খেলার জুতো যার নীচে গোল গোল উঁচু উঁচু স্টার লাগানো থাকত। সেই জুতো পরে হোস্টেলের করিডরে হাঁটলে একটা কচরমচর অদ্ভুত শব্দ করত। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় আমাদের সবাইকে আবার 'রানিং শু' আনতে বলা হয়েছিল। সে এক অদ্ভুত জুতো। জুতোর নীচে ছুঁচালো হাফ ইঞ্চি সাইজের পেরেকের মতো লাগানো থাকত। স্কুলে ঢোকার সময় কিনে আনা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আমি ওই জুতো কোনোদিন ব্যবহার করিনি। আমি এর ব্যবহার জানতামও না। পরবর্তীকালে দেখলাম এটা অ্যাথলেটরা দৌড়ানোর সময় ব্যবহার করে দৌড়ানোর সময় ভালো 'গ্রিপ' পাওয়ার জন্য। আমাদের ক্লাসেও যথারীতি

কয়েকজন বাঘা বাঘা দৌড়বাজ ছিল যারা এই রানিং শু-র পুরো সদ্ব্যবহার করেছিল।

এবার আসি জুতো পালিশের কথায়। সাদা কাপড়ের জুতো 'কেডস' আমরা রবিবারে 'সানলাইট' সাবান দিয়ে ধুয়ে ব্রাশ মেরে নিতাম তারপর রোদে শুকিয়ে গেলে সাদা চক পালিশ করতে হত। এই চক্ পালিশ আবার দু-রকমের ছিল। একটা গোল সাদা সাবানের মতো আর একটা সাদা রেডিমেড লিকুইড একটা লম্বা আকৃতির কৌটোর মধ্যে। এটা একটু দামি সুতরাং আমার কেনার সুযোগ হয়নি কিন্তু বন্ধুদের থেকে নিয়ে ব্যবহার করেছি। যা হয় হোস্টেল যেকোনো বস্তু কিছু নিজের বলে হয় না সব জিনিস সবার। পুরো সাম্যবাদী পলিসি!

রবিবারে জুতো পালিশের একটা ধুম পড়ে যেত। সবাই বিভিন্ন ধরনের শু-পালিশ ও জুতোর ব্রাশ নিয়ে পালিশ করতে বসে যেত যেন প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তখনকার দিনে 'চেরিব্লসম আর কিউই' এই দুটো জুতোর পালিশই বেশি ব্যবহার হত। ততদিনে এখনকার মতো লিকুইড পালিশ শু-সাইনার ইত্যাদি বাজারে আসেনি যারফলে আমরা পাতি মুচির মতোই নিজের জুতো নিজেই পালিশ করতে মেঝেতে বসে যেতাম। জুতোর ব্রাশেরও বিভিন্ন রকম ছিল। যেমন, সফ্ট ব্রাশ, হার্ড ব্রাশ।

প্রথমে শু-পালিশটা জুতোয় লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ওই ফাঁকে তখন একটু আড্ডা মেরে নিতাম। তারপর বাঁ

হাতের চারটে আঙুল জুতোর পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে বুড়ো আঙুলটা বাইরে রেখে ডান হাতে ব্রাশ নিয়ে দ্রুত গতিতে ঘষতে থাকতাম। ততক্ষণে জুতো চমকাতে শুরু করে দিত। সেটা হয়ে গেলে একটা লম্বা কাপড় নিয়ে জুতোর ওপর ঘষতে হবে যাতে জুতো আরও চকচক করে। তখন সাময়িকভাবে জুতোটা পায়ে পরে দুই হাতে দুই ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের টুকরোটা ধরে ডানে-বাঁয়ে ক্রমাগত ঘষতে হবে। এটাকে বলা হত 'র‍্যাগিং'।

কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। ওই সময় কেউ এসে বলে গেল যে, 'এমন পালিশ করবে যাতে চকচকে জুতোয় নিজের মুখ দেখা যায়'। ব্যাস আর যায় কোথায়, সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল জুতোর মাথায় নিজের মুখ দেখার জন্য। ওই বয়সে তখন মাথায় ঢুকত না যে এই ডায়ালগটা বলার জন্য বলা।

কিছুদিনের মধ্যেই জুতো পালিশ করার এক নতুন পদ্ধতি প্রচলন হল। সেটা হল 'ওয়াটার পালিশ'! কী সেটা? জল আর পালিশ মিশিয়ে চামড়ার জুতোতে লাগাতে হবে। তার আগে অব্দি আমরা জানতাম যে চামড়ার জুতোতে জল দিলে জুতো খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সেই থিয়োরি সরিয়ে রেখে আমরা সবাই 'ওয়াটার পালিশ' নিয়ে মেতে যেতাম।

এই জুতো পালিশের প্রক্রিয়া যখন শেষ হত ততক্ষণে আমাদের হাতে, মুখে, বুকে কালো পালিশ লেগে একাকার।

হোস্টেলে সবসময় জল থাকত না সুতরাং ধোয়ার উপায় নেই। হাতটা কোথাও মুছে নিতাম ব্যাস খেল খতম।

পরের দিন প্যারেডের সময় সবার জুতো পরিদর্শন করত হাউস ক্যাপ্টেন কখনো স্কুল ক্যাপ্টেন আর যাদের জুতো বেশি সাইন করত তারা বাহবা পেত। এই ফাঁকে চুপিচুপি জানিয়ে রাখি আমি অনেক চেষ্টা করেও এই জুতো সাইনের জন্য কোনোদিন বাহবা পাইনি।

অনেকদিন এমনও হয়েছে আমরা জুতো পালিশ না করে গিয়েছি, ব্যাস! হঠাৎ ঘোষণা করা হল স্কুল ক্যাপ্টেন জুতো পরিদর্শন করবে। তখন আমরা তৎকালীন জরুরি ব্যবস্থা নিতাম। ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ের মোজায় ঘসে নিতাম আর বাঁ পায়ের জুতোটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের মোজায় ঘসে নিতাম। ব্যাস খেলা শেষ।

আমাদের জুতো ছাড়াও বেল্ট পালিশ করতে হত। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই আমাদেরকে খাকি প্যান্টে পরার জন্য আর এন.সি.সি. ড্রেসের সঙ্গে কোমরে পরার জন্য লাল চামড়ার বেল্ট দেওয়া হয়েছিল। সেটার বাঁ দিকে একটা সৈনিক স্কুলের 'এমব্লেম' থাকা পিতলের গোলাকৃতি চাকতি ছিল যেটার মাধ্যমে বেল্টটা টাইট ও লুজ করা যেত। এটা আবার এখনকার মতো সাধারণ বেল্টের মতো না। সেই লাল বেল্টটা যেহেতু চামড়ার সুতরাং পালিশ করতে হবে! সেই বেল্টটা কালেভদ্রে কিংবা এন.সি.সি.-র আগের দিন লাল রং দিয়ে পালিশ করতে হত। কোনোমতে লাল পালিশ জোগাড় করে ব্রাশ মারতাম আর লাল পালিশ না পেলে খালি ব্রাশ দিয়ে ঘষে দিতাম। সেই বেল্ট ব্রাশ করার আবার কায়দা ছিল। খাটে বসে লাল বেল্টটাকে হাঁটুর ওপরে জড়িয়ে নিয়ে ব্রাশ অথবা কাপড় দিয়ে দ্রুত গতিতে ঘষতে হত। তারপর? তারপরেও রক্ষা ছিল না। মাঝখানের পিতলের অংশটা ব্যবহারের ফলে কালো ও বিবর্ণ হয়ে যেত। তখন সেই পিতলের চাকতিটা পালিশ করার জন্য ব্রাসো ব্যবহার করতাম। এই ব্রাসো জিনিসটা একটা টিনের লম্বা কৌটোর মধ্যে থাকত। এটা লিকুইড আর গন্ধটা ঠিক কেরোসিনের মতো। এক টুকরো কাপড়ে লাগিয়ে ঘষতে হত পিতলের চাকতিটাতে। অল্প ঘষার পর আস্তে আস্তে চাকতিটা আলাদিনের চেরাগের (প্রদীপ) মতো উজ্জ্বল হয়ে চমকাত আর ততক্ষণে গোটা ঘরময় কেরোসিনের গন্ধে ম ম করত। সেই ব্রাসোর জায়গা এখন 'পিতাম্বর' নিয়ে

নিয়েছে পিতলের জিনিস পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখার জন্য। আর এন.সি.সি. টুপির সামনে লাগানো রূপালি লোগোটা পালিশ করার জন্য আমরা ‘সিলভো’ বলে একটা পালিশ ব্যবহার করতাম।

গোটা আট বছরের স্কুল জীবনে রুটিন করে জুতো পালিশ করতে করতে এখনও সেই অভ্যাস থেকে গেছে। এখনো আমি নিজের জুতো নিজেই পালিশ করি। অপরিষ্কার জুতো পালিশ না করে পড়তে পারি না। এটা না বললেও চলবে যে সৈনিক স্কুলের প্রতি আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।

পিকনিক

সৈনিক স্কুলের হোস্টেলে প্রথম যখন ক্লাস ফাইভে ঢুকলাম তখন প্রথমেই আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল আমরা যেন প্রতি সোমবারে বাড়িতে চিঠি লিখি। ওই দশ বছর বয়সে হোস্টেলে থাকি সুতরাং বাড়ির লোকদের চিন্তা হওয়াটা স্বাভাবিক। আমাদেরকে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপে পোস্টকার্ড, ইংল্যান্ড, স্ট্যাম্প থাকা খাম ইত্যাদি দিয়ে দিত আর সোমবার সকালে হাউস ক্যাপ্টেন সবার থেকে লেখা চিঠিগুলো নিয়ে পোস্ট করে দিত লালরঙের স্কুলের মেইন পোস্টবক্সে। সন্দেহ হলে হাউস ক্যাপ্টেন অথবা হাউস মাস্টার কিছু চিঠি পড়ে কিছু উলটোপালটা কিংবা নিন্দনীয় কিছু লিখলে সেন্সর করে পোস্ট করত। প্রথম প্রথম চিঠি লেখা মানে ভীষণ কষ্টকর কাজ মনে হত। মনের মধ্যে অনেক কথা থাকলেও প্রকাশ করা যেত না। বেশিরভাগ সময় পোস্টকার্ডই ব্যবহার করতাম যাতে কম লিখতে লাগে। অনেক ছেলেদের আবার বাড়ির থেকে পোস্টকার্ডে ঠিকানা লিখে দিয়ে দিত বাবা-মায়েরা যাতে হোস্টেলে পড়া ছেলে দু-কলম লিখে পোস্ট করে দিলেই শান্তি যে ছেলে ভালোই আছে। তখনই শিখলাম কীভাবে কোনো জায়গায় বাড়ির ঠিকানা লিখতে লাগে। আমাদের সঙ্গের এক ছেলে ক্লাসের অঙ্ক বুঝতে না পারলে চিঠিতে অঙ্ক লিখে খামে

পাঠাত বাড়িতে যেই অঙ্কের উত্তর আবার বাড়ি থেকে আসত বেশ কিছুদিন পর।

এখন সেসব মান্ধাতা আমলের কাজকারবার ইতিহাস হয়ে গেছে। এখন মোবাইল ফোনে যখন খুশি ফোন করলেই গলার আওয়াজ শোনা যাবে, ভিডিয়ো কল করলে চেহারা দেখে গল্পও করা যাবে।

ঠিক ওইসময় ক্লাস ফাইভে পুজোর বন্ধের পরেই এক রোববারে আমাদেরকে বাসে করে রাঁচি আর জামশেদপুর ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সকালে গিয়ে রাত্রে ঘুরে এসেছিলাম পিকনিক করে। বাসে সব রান্নার সরঞ্জাম ও রান্নার কুক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওখানে গিয়ে কাছেপিঠে পাহাড়, ঝর্ণা, জুবিলি পার্ক ইত্যাদি দেখে ঘুরে এলাম।

পরেরদিন চিঠি লেখার পালা। সবাই চিঠি লিখছে পিকনিকে গিয়ে কী দেখলাম কীরকম আনন্দ করলাম এইসব। আমার সঙ্গের এক বন্ধু রাউত তার আবার ইংরেজির হাতের অক্ষর ঝরঝরে খুব সুন্দর ছিল। সে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে এসেছিল বোধহয় যারজন্য সে আমাদের পিকনিকের বর্ণনা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ইংরাজিতে চিঠি লিখছিল। সেই দেখে আমারও শখ গেল ইংরেজিতে চিঠি লেখার। ব্যস আমি তার লেখাটা পুরো কপি করে চিঠি লিখে ফেললাম। তাও আবার একটা নয় দুটো চিঠি লিখে ফেললাম একই বক্তব্য একটা বাড়িতে

আর একটা মামাকে। আমি ঠিকানা লিখে পোস্ট করে দিলাম। বাড়িতে আমার লেখা ইংরাজিতে চিঠি পেয়ে অবাক। তখনকার দিনে মফস্সল শহরে ইংরেজিতে ফরফর করে কথা বলা কিংবা, ইংরেজিতে চিঠি লেখা মানে বিরাট ব্যাপার। তারপর জানুয়ারি মাসে যখন শীতের ছুটিতে বাড়ি গেলাম তখন বাড়ির লোকেরা আনন্দে আটখানা যে ছেলে এত কম সময়ের মধ্যে স্কুলের হোস্টেলে গিয়ে ইংরেজি শিখে ফেলেছে, ইংরেজিতে চিঠি লিখছে। আমিও চুপকরে সেই আনন্দ উপভোগ করলাম। আমিও আসল ঘটনাটা জানালাম না আর ঘুণাক্ষরেও কেউ আসল ঘটনাটা টেরও পেল না।

নাগা বন্ধুরা

আমাদের সৈনিক স্কুলে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেরা পড়তে আসত। গোটা পূর্বাঞ্চলের যেসব রাজ্যে সৈনিক স্কুল ছিল না সেখান থেকে ছেলেদের আমাদের সৈনিক স্কুলে পড়তে পাঠানো হত। তার মধ্যে নাগা, মনিপুরী আর অরুণাচলের অনেক ছেলেরা ছিল। তবে নাগা ছেলেদের আধিক্য ছিল। অরুণাচল যেহেতু সেই বছরে ইউনিয়ন টেরিটোরির মর্যাদা পায় যেই বছরে আমরা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম সেটা ছিল ১৯৭২ সন সেইজন্য সেখানকার ছেলেরা নিজেদেরকে পরিচয় দিত NEFA-র (North Eastern Frontier Agency) বাসিন্দা বলে। আমাদের ক্লাসে চার-পাঁচ জন নাগা ছেলে পড়ত। আর এক ক্লাসে নীচের ক্লাসে আরো কিছুজন। এরা সাধারণত একসঙ্গে ঘোরাফেরা করত যেহেতু তাদের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস আলাদা ছিল।

প্রথমদিকে তাদের নামগুলো খুব অদ্ভুত লাগত, উচ্চারণ করতে জিভে জড়তা আসত। আস্তে আস্তে নামগুলো বলা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজনকে আমরা টাইটেল ধরে ডাকতাম আর সেটাই তাদের চালু নাম হয়ে গিয়েছিল। পরের দিকে তাদের নামই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আমি জানি এই নাগাদের মধ্যে অনেক ট্রাইব আছে আর তাদের নামের পরে টাইটেলটাই হচ্ছে

তাদের ট্রাইবের পরিচয়। ওদের প্রত্যেকটা ট্রাইবের আবার ভাষা আলাদা, সামাজিক রীতিনীতিও আলাদা। কিন্তু একজন নাগা মানুষ যখন অন্য এক ট্রাইবের নাগা লোকের সঙ্গে দেখা হয় তখন যেই ভাষায় কথা বলে সেটা হল নাগামিজ ভাষা। এই নাগামিজ ভাষার সঙ্গে অসমিয়া ভাষার অনেক মিল, আবার অসমিয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার খুব মিল। যারজন্য নাগাদের মুখে নাগামিজ ভাষা শুনলে আমরা অল্প অল্প বুঝতে পারতাম। সেই নাগামিজ ভাষায় ছিল তাদের কথোপকথনের ভাষা।

এই নাগা ছেলেরা সকালের পি.টি.-তে খুব পারদর্শী ছিল, এন.সি.সি. খুব ভালো করত। তারা খেলাধুলাতে প্রচণ্ড ভালো ছিল। প্রধানত ফুটবল, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলাতে ওস্তাদ ছিল। বাৎসরিক স্কুল স্পোর্টে রানিং, শটপুট থ্রো, ডিসকাস থ্রো, জ্যাভলিন থ্রো-তে নাগারা অনেক মেডেল জিতে নিত। যেহেতু চারটে হোস্টেলের মাঝে আর কখনো ক্লাসের মাঝে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হত সেহেতু যাদের দিকে বেশি নাগা ছেলে থাকত তারা বেশি লাভবান হত।

প্রথমবার স্কুলে ঢুকেই আমরা এক কড়া মেজাজের নাগা স্কুল ক্যাপ্টেন পেলাম। সবে তখন নতুন স্কুলে ঢুকেছি ইংরেজি ভাষাটাও ভালোভাবে রপ্ত হয়নি আর নাগা উচ্চারণে ইংরেজি আরও বিদঘুটে লাগত।

প্রতি রবিবার আমাদের ছুটি থাকত। আমরা সেদিন দেরি করে উঠে দেরি করে দিনটা শুরু করতাম। কেউ খেলাধুলা করত, কেউ আড্ডা দিত, কেউ ঘুমোত, আর আমার মতো কয়েকজন স্কুলের চারিদিকে গাছপালা, পুকুর ইত্যাদি দেখে ঘুরে বেড়াত।

কিন্তু আমাদের নাগা বন্ধুরা সবসময় দল বেঁধে একসঙ্গে ঘুরত। রবিবারে হাতে গুলতি নিয়ে কাঠবিড়ালি শিকার করত। গাছপালা থাকা জায়গায় ছোটো ছোটো পাখিও শিকার করত। অনেক সময় ডোবা বা পুকুরে নেমে মাছ, শামুক, কাঁকড়া ধরে আনত। খালি ধরত না বাইরে লুকিয়ে রান্না করে কিংবা আধ-পোড়া করে পেটপুজো করত। তাদের উৎপাতে গাছে কাঠবিড়ালি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

প্রতি বছর পূজার সময় আমরা সাতদিনের ছুটি পেতাম। আমরা সবাই বাড়ি যেতাম কিন্তু যাদের বাড়ি দূরে ছিল যেমন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ডিমাপুর, আসাম তারা ওই অল্প কয়েক দিনের ছুটিতে আর বাড়ি যেত না। তারা সবাই স্কুলেই থেকে যেত।

আমরা যখন ক্লাস নাইনে পড়ি ১৯৭৭ সনে সেবার দুর্গাপুজোর সময় পশ্চিমবঙ্গে বন্যা হয়েছিল। চারিদিকে রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যারজন্য সেবার পুজোয় আমার আর বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেইবার ওই ছুটির সাতদিন নাগা বন্ধূদের কীর্তিকলাপ কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। সকালে

ব্রেকফাস্ট সেরে দুপুরের খাওয়া অব্দি বনে-বাদাড়ে ওদের সঙ্গে ঘুরতাম। ওরা গুলতি দিয়ে কীভাবে শিকার করে সেটা দেখতাম। কিন্তু হাত লাগাতে সাহস হত না। একদিন তাদের সাথে সকাল থেকে একটা ছোটো পুকুরে মাছ ধরতে নামলাম। নাগা বন্ধুরা মাছ ধরার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল বিছানার মশারি মাছ ধরার জাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। সেদিন আমরা পেয়েছিলাম ছোটো ছোটো অনেক জ্যন্ত সতেজ মাছ আর পুকুরের পাশের গর্তে হাত ঢুকিয়ে অনেক কাঁকড়া। ওদের সঙ্গে অভ্যস্ত না থাকা অকাজ করতে গিয়ে যখন নোংরা জল থেকে উঠে এলাম তখন আমার দু-পায়ে লেগে ছিল জোঁক। কোনোমতে জোঁক থেকে নিস্তার পেয়ে হোস্টেলে ফিরে যখন দুপুরে খেতে বসলাম তখন দেখি সেই কাঁকড়া আর ছোটো মাছগুলো ভেজে আমাদের পরিবেশন করা হয়েছে।

সাধারণত তারা পড়াশোনাতে খুব একটা সুবিধা করতে পারত না। কোনোমতে উতরে যেত কিন্তু খেলাধুলা বা অ্যাথলেটিক স্পোর্টে তারা ছিল অপরিহার্য।

অনেক নাগা বন্ধু ক্লাস টেনের পরে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। বাকি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্লাস টুয়েলভের পরে যে যার জায়গায় গিয়ে নিজস্ব কেরিয়ারে ব্যস্ত হয়ে যায়।

এখন মোবাইল ফোনের দৌলতে আবার তাদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। একজনের অকালে মৃত্যু হয়েছে, কয়েকজন এখনও অধরা। আর বেশ কয়েকজন উঁচু পোস্টে আজও অধিষ্টিত হয়ে আছে কেউ নাগাল্যান্ডে, কেউ অরুণাচলের ইটানগরে। ওদের সঙ্গে দেখা হয় না কিন্তু মাঝে মধ্যে খবরাখবর পাওয়া যায়। তখন মনে পড়ে যায় স্কুল জীবনের তাদের কীর্তিকলাপ।

‘ভরা থাক স্মৃতিসুধায় হৃদয়ের পাত্রখানি...’।

কৈশোরের দোরগোড়ায়

আমাদের শরীরে কবে যে কৈশোর এসেছিল সঠিক মনে নেই কিন্তু ববি সিনেমার হাত ধরে কৈশোরকে অনুভব করতে শিখেছিলাম। যখন আমরা ক্লাস সেভেনে তখন থেকেই অল্পবিস্তর শারিরীক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারছিলাম। মানসিক পরিবর্তন বুঝতে আরো দেরি হয়েছিল। আমাদের ছেলেবেলা থেকে যৌবন অব্দি সব নিষিদ্ধই জেনে এসেছিলাম। প্রেমের বই, অ্যাডাল্ট সিনেমা, যৌন সংক্রান্ত কোনো কথাবার্তা সব ছিল তখন 'forbidden fruit' এমনকী অঙ্কের পরিমিতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Mensuration-টাও খুব সাবধানে উচ্চারণ করতে হত। ভালোভাবে Sex education দেওয়াও হত না যার ফলে সঠিক জানার থেকে ভুল জেনেই আমরা বড়ো হলাম। তখন না ছিল অ্যানড্রয়েড ফোন, না ছিল ইন্টারনেট আর না ছিল খোলাখুলি যৌন আলোচনা।

যেহেতু আমাদের ক্লাসের সব বন্ধুদের বয়স এক ছিলনা যার ফলে সবার কৈশোর বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছিল। সময়ের খুব ফারাক না থাকলেও একটু আগে পরে কৈশোর এসে হামলা করেছিল। হ্যাঁ হামলায় বলব কেন-না এ যেন না জানিয়ে অনাহুত অতিথির প্রবেশ। শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোম বের হয়ে

যাচ্ছে। কচি ধানখেতের মতো দাড়ি-গোঁফের আভাস দেখা দিচ্ছে। হঠাৎ করে গলার আওয়াজ কেমন হেঁড়ে হয়ে গেল যেন গলায় ব্যাঙ ঢুকে বসে আছে! মুখ থেকে আস্তে আস্তে ছেলেমানুষি ভাবটা সরে গেল। মুখে অদ্ভুত সব ব্রণ বের হয়ে কেমন যেন ক্ষুধার্ত রাগ রাগ ভাব মুখে জায়গা করে নিল। আয়নাতে নিজের মুখটা নিজের কাছে অচেনা মনে হত। এদিকে মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগে আসে না। নিত্যনতুন চুলের কায়দা করতে করতে সময় চলে যেত তাও চুলের স্টাইল ঠিক মনঃপূত হত না।

ওইরকমই সময় যখন আমার শরীরে-মনে কৈশোরের হাওয়া লাগেনি তখন একদিন আমাদের স্কুলের হোস্টেলের এক বন্ধু রাত্রে গোপনে একটা বই পড়ে শোনাতে লাগল। বইটা সে লুকিয়ে বাড়ির থেকে এনেছিল তাও আবার হিন্দিতে। আমি তখন হিন্দি কিছুই বুঝতাম না। একে রাত্রিবেলা যারফলে চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এদিকে হিন্দিতে বলার জন্য এক বিন্দুও বুঝছিলাম না যারজন্য কোনো উত্তেজনা বা আগ্রহ লাগছিল না। কিন্তু তখন আমার সেই অনুরোধে ঢেকি গেলার মতো অবস্থা। কোনোমতে ঢুলতে ঢুলতে শুনছি। তবে এটুকু বুঝেছিলাম যে ওটা একটা নিষিদ্ধ বই।

এমন সময় রুমের লাইট জালানো দেখে হঠাৎ এক সিনিয়র দাদা এসে হাজির। আমরা কিছু বোঝার আগেই সেই নিষিদ্ধ বই বাজেয়াপ্ত। সেই দেখে আমার ঘুম গেছে উড়ে। আর

আমার সঙ্গের বন্ধু রেগে গরম তার সেই নিষিদ্ধ বই বাজেয়াপ্ত হওয়ার জন্য। আমি ভয়ে ভয়ে বন্ধুকে জিগ্যেস করলাম, 'এখন কী হবে?' সে বলল, 'বইটা শুদ্ধ হিন্দিতে লেখা সুতরাং যে নিয়েছে সে কিচ্ছু বুঝবে না।' ঠিক তাই হল পরেরদিন সেই সিনিয়র দাদা বইটা ঘুরিয়ে দিল কিন্তু তারপর আর কী হল তা জানা নেই।

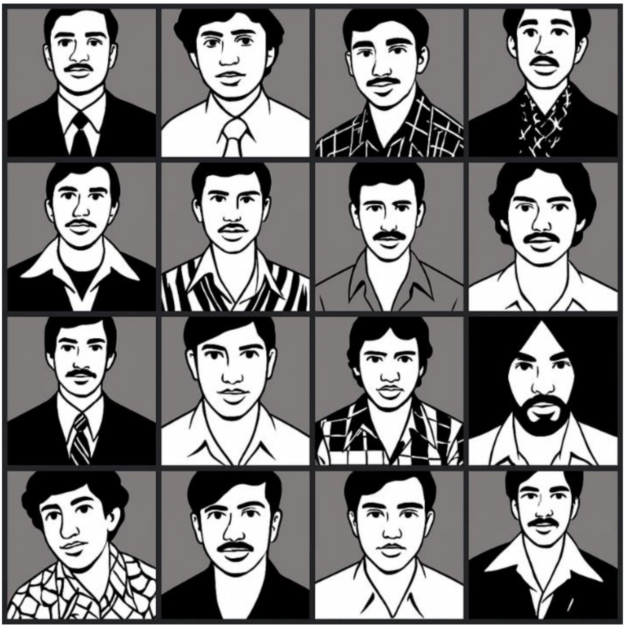

আমাদের স্কুলটা ছিল রেসিডেন্সিয়াল ছেলেদের স্কুল। যারজন্য আমরা কোনো মেয়ের দেখা পেতাম না। কৈশোর যেন একাকী এসে গেছে। এ যেন সেই প্রাচীন আশ্রমে ব্রহ্মচর্য পালন করার মতো অবস্থা। আর যেহেতু মেয়েদের দেখা পেতাম না সুতরাং তাদের সম্বন্ধে অজানা কৌতূহল থেকেই যেত।

আমরা যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন এক নতুন হিন্দিভাষী টিচার আমাদের স্কুলে জয়েন করলেন। উনি কী পড়াতেন সঠিক মনে নেই। ইতিহাস কিংবা ইংরেজি কিছু হবে। সেই স্যারের আমাদের বয়সী এক মেয়ে ছিল সুতরাং নিয়মের বাইরে গিয়ে তাকে আমাদের ক্লাসে ভর্তি করা হল। সে যেহেতু স্যারের মেয়ে সে ক্যাম্পাসের কোয়ার্টার থেকে আমাদের ক্লাসে ক্লাস করতে আসত। আর আমরা তাকে নিয়ে জল্পনাকল্পনা করতে লাগলাম যে সেই মেয়ে ক্লাসে কার পাশে বসবে, কার কার সঙ্গে কথা বলবে, কাকে পাত্তা দেবে আর কাকে দেবে না। বছর খানেক সে আমাদের সঙ্গে থাকল তারপর তার বাবা যখন চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেল তখন সবার স্বপ্নভঙ্গ করে সেও স্কুল ছেড়ে চলে গেল। সবে ধন নীলমণি গায়েব! আবার আমরা সবাই ক্লাসে এক-শো ভাগ ছেলে হয়ে গেলাম। সেই মেয়ে বান্ধবী যেদিন প্রথম প্রথম ক্লাস করতে এসেছিল একদিন কোনো-এক সাহসী ছেলে চুপচাপ সেই মেয়েটির ডেস্কে একটা জ্যান্ত কোলা ব্যাং রেখে দিয়েছিল। ব্যাস, ক্লাসে এসে মেয়েটা যেই তার ডেস্ক খুলেছে, ব্যাং মামা লাফিয়ে বের হয়েছে। ক্লাসে হুলুস্থুলু আর মেয়েটা ভয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে গিয়েছে। এদিকে ছেলেরা মহাবিক্রমে সেই দৃশ্য উপভোগ করছে। Vicarious আনন্দলাভ বোধহয় এটাকেই বলে। এইসব বয়সের দোষ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের মতো আসে আবার চলে যায়।

কিন্তু কৈশোর তো হার মানবে না। যৌন আকর্ষণ তৈরি হবেই। সেটাই 'লিবিডো'। ওই বয়সে সেই লিবিডোই প্রতিফলিত হয় কবিতায়, খেলাধুলায়, শিল্পে এবং সম্পর্কের বেড়াজালে। বন্ধুত্বের মধ্যে মনের-আদান প্রদান হয় কিন্তু তার ভিতরে Lust বা যৌনতা ঢুকে গেলেই সেটা আর সাদামাটা বন্ধুত্ব থাকে না। সুতরাং ছেলে ছেলের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব হত এমনকী নিবিড় সম্পর্কও তৈরি হত সেই হোস্টেল জীবনে। তারমানে কী সমকামিতা? সেটা ছিল খুব সাময়িক, স্থায়ী নিশ্চয় নয়।

স্কুল ছাড়ার পরে এই বিষয়টা নিয়ে আমি খুব ভেবেছি। আত্মবিশ্লেষন করেছি। ভবিষ্যতে সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ার পরে এর জবাব আমি পেয়েছি। এটাকে বলে Obligatory Homosexuality, Transitory Homosexuality, অথবা Ego-dystonic Homosexuality যখন কোনো চয়েস বা উপায় থাকে না তখন মানুষের সাময়িকভাবে অনেক সময় এইরকম হয়। যেমন কারাগারে, মিলিটারি ব্যারাকে আর ছেলেদের হোস্টেলে কখনো বা ব্রহ্মচর্য আশ্রমে।

আমার খুবই প্রিয় লেখক, সাইকোঅ্যানালিস্ট প্রফেসর সলমন আখতার ওঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, বেশিরভাগ মানুষ তাদের গোটা জীবনে কয়েকটা কথা নিয়ে খুব দ্বন্দ্বে ভোগে। তারা জীবনে পাঁচটা জিনিস নিয়ে কয়েক মুহুর্তের জন্য হলেও দ্বিধাবিভক্ত থাকে। তারমানে তাঁরা ঠিক বুঝতে পারে না তাঁরা

কোনদিকে। যেমন, প্রথম সে নারী না পুরুষ। জীবনের কোনো-এক সময় নিজের কর্যকলাপ দেখে, নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সন্দেহ জাগে সে নারী না পুরুষ। সুইস মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল ইয়ুং বলে গেছেন যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেটাকে তিনি Anima ও Animus বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, জীবন ও মৃত্যু (Life vs Death)। মানুষ জানে যে তার মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তবু সে নিজেকে অমর ভাবতে ভালোবাসে। কখনো আবার এমন পরিস্থিতি আসে যে সে নিজেকেই প্রশ্ন করে যে, সে বেঁচে আছে তো? তৃতীয়ত, সে

আস্তিক না নাস্তিক। একজন মানুষ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, হঠাৎ কোনো একদিন তার কিছু সময়ের জন্য হলেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে যায়। যেমন আমরা অনেকসময় লোকের মুখে শুনে থাকি, "আমি এত ঈশ্বরের প্রার্থনা করি কিন্তু আমারই এমন বিপদ হচ্ছে কেন, ঈশ্বর কি কিছুই দেখতে পান না?" আবার একজন নাস্তিক লোক নিজের অজান্তেই বলে ওঠে, "হায় রাম!" কিংবা, "Oh God!"

চতুর্থত, একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় কোনো-এক সময়ে দ্বিধায় ভোগে যে সে সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় (Active vs Passive). এমন কোনো পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই করার থাকে কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকা হয়। নিজের ওপর তখন রাগ, গ্লানি ও পরে অপরাধবোধ হয় নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য। তখন নিজের ওপর সন্দেহ জাগে যে সে কি সত্যিই সক্রিয় না এক নিষ্ক্রিয় মানুষ।

পঞ্চমত, সে সমকামী না অসমকামী (Homosexual vs Heterosexual)। এই শেষ পয়েন্টটাই এখানে উল্লেখযোগ্য ও খুবই প্রযোজ্য।

ওই কৈশোরের দোরগোড়ায় এসে যখন শরীর মনের টানাপোড়েন ও উচাটন চলত তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা খুব মনে আসত আর মনটা তখন শান্ত হয়ে যেত...

‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব পানে।।”

‘গেমস ও কো-ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিস’

আমাদের সৈনিক স্কুলে প্রত্যেকটা ছাত্রকে সবকিছু শেখানো হত। বিভিন্ন ‘কো-ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিস’ (সহ-পাঠক্রমনিক কার্যাবলী) শেখার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। এক কথায় বলা যায় (আমার মতে) পড়াশোনা করাটা গৌণ আর বাকি কো-ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিসগুলো মুখ্য! আমাদের স্কুলে সবকিছু শেখানো হত যেমন, খেলাধুলা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, তর্ক প্রতিযোগিতা, গান বাজনা, নাটক করা আরো কত কী। এখন শুনেছি এইগুলোর সঙ্গে সাঁতার, হর্স-রাইডিংও শেখানো হয়। এসব শেখানোও হত আর প্রতি বছর নিয়মানুযায়ী এইসব খেলাধুলার প্রতিযোগিতাও হত। সেই প্রতিযোগিতায় যারা জিতত তাদেরকে বার্ষিক ‘অ্যানুয়াল ডে’-তে প্রাইজ দেওয়া হত সবার সামনে।

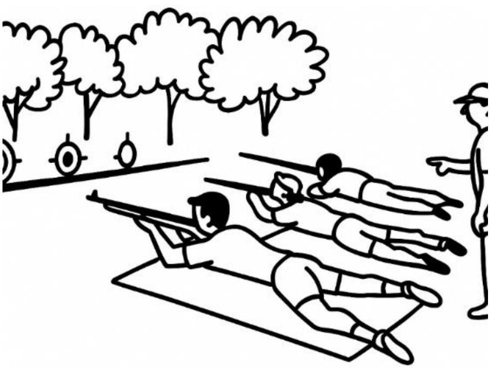

খেলাধুলার মধ্যে কী ছিল না, ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল, বক্সিং, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন। প্রত্যেকদিন লাঞ্চের একঘণ্টা পরেই তিনটে থেকে পাঁচটা অব্দি বিভিন্ন 'গেমস' খেলা বাধ্যতামূলক ছিল।

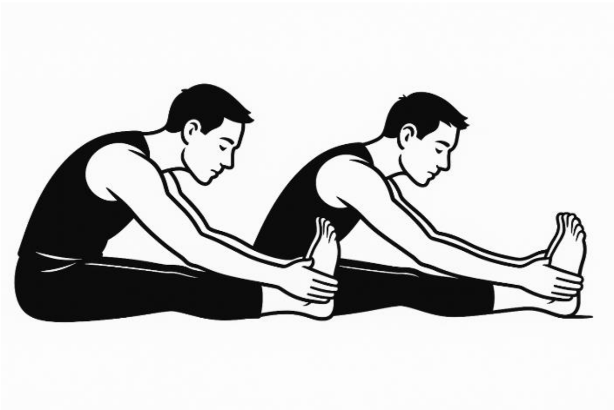

সৈনিক স্কুলে গোটা ক্যাম্পাস জুড়ে অনেক খেলার মাঠ ছিল আর সেই ফিল্ডগুলো চেনার জন্য বিভিন্ন নাম ও নম্বর ছিল। যেহেতু গেমস খেলা ছিল বাধ্যতামূলক সুতরাং প্রতিদিন সবার জন্য বরাদ্দ থাকত বিভিন্ন ফিল্ড। নোটিস বোর্ডে ক্লাস অনুযায়ী কোন ক্লাস কী খেলবে, কোথায় খেলবে সব লেখা থাকত। আর আমরা সেই অনুযায়ী অর্ডার পালন করতাম। কয়েকটা ফুটবল মাঠ স্কুল গেটের বাইরে রাঁচি রোড পার করে যেতে হত সঙ্গে থাকত কোনো-এক শিক্ষক অভিভাবক হিসেবে। রেললাইনের পাশে চারটে মতো ফুটবল খেলার মাঠ আমাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। সেই রেললাইন দিয়ে ন্যারোগেজের ছোটো ট্রেন যাওয়া-

আসা করত। ট্রেনটা কোথায় যেত জানতাম না কিন্তু বিকেলে খেলার সময় সেই ছোটো ট্রেনটা যখন যাত্রী বোঝাই করে ‘কু ঝিক ঝিক’ করে পুরুলিয়া স্টেশনের দিকে যেত আমার মনটা উদাস হয়ে যেত। আসলে বাড়ির কথা মনে পড়ত। আমরা কয়েকজন অনেকদিন ট্রেনটার সঙ্গে পাশাপাশি দৌড়াতাম তারপর মাঠের শেষপ্রান্তে থেকে আবার ঘুরে আসতাম। এটাও একধরনের ছেলেমানুষি খেলা ছিল। এখন সেই দৃশ্যটা মনে করলেই ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমার অপুকে মনে পড়ে যায়। আমার মনে হয় আসলে সবার মধ্যেই তো একটা গ্রাম্য অপু লুকিয়ে থাকে।

বর্তমানে এই মাঠগুলোতে আর স্কুলের ছেলেরা খেলতে যায় না। এটা আসলে স্কুলের সম্পত্তির আওতায় পড়ত না। এখন এখানে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান হয়েছে বোধহয় ‘সিধু কানু ইউনিভার্সিটি’।

স্কুলের মেইন হকি ফিল্ডটা ছিল আমাদের প্যাটেল ও টেগোর হাউসের পিছনের মাঠটা। এই মাঠটাতে কোনো ঘাস ছিল না যারজন্য খেলতে গিয়ে পড়ে গেলে আঘাতে হাত পা ছড়ে যাওয়া অনিবার্য ছিল। এই ফিল্ডেই আমাদের মাঝে মাঝে হাফপ্যান্ট পরে শাস্তিস্বরূপ ‘নিলডাউন’ হতে হত। এর পরের অবস্থা কী হত আর বললাম না।

মেন ভলিবল ও বাস্কেটবল ফিল্ডটা সামনেই ছিল। ঠিক মেইন জলের ট্যাঙ্ক থেকে একটু এগিয়ে হসপিটাল পাওয়ার আগেই। এই দুটো ফিল্ড বেশ পাশাপাশি যমজ ভাইয়ের মতো অধিষ্ঠান করত। আর তার একটু দূরেই ভিলেনের মতো সিমেন্টের তৈরি উঁচু ঘেরা জায়গাটা চোখ রাঙাত। সেটা ছিল আমাদের বক্সিং রিং। সেটা সাধারণত সারা বছর অব্যবহৃত ভাবে পড়ে থাকত যতদিন না বক্সিং প্রতিযোগিতা শুরু হত। তখন সাজসাজ রব পড়ে যেত।

টেবিল টেনিস আসলে ইনডোর গেমস যারজন্য তার জায়গা ছিল তিলক ও চিত্তরঞ্জন হাউসের মাঝখানের কমন রুমে। ওখানে কালেভদ্রে খেলা হত। যখন প্রতিযোগিতা হত আমরা টেবিলের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিদের উৎসাহ দিতাম। আজকের দিন হলে আমাদের ‘চিয়ারলিডারস’ বলা হত।

এখন ভেবে দেখি আমি খেলোয়াড় না হলেও সবধরনের খেলার কথা স্কুল থেকে জেনে ও শিখে এসেছি। সেটা ভবিষ্যতে সবার আর ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের ভীষণ কাজে লেগেছে।

সেইরকম খেলাধুলা ছাড়া বাকি কো-ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিসগুলো রুটিন মেনে করানো হত। প্রতি শনিবারে সন্ধেবেলার প্রেপের (পড়াশোনা করার সময়) পরিবর্তে বিভিন্ন টপিকের ওপর বিভিন্ন ভাষায় (ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি) বক্তৃতা

প্রতিযোগিতা হত। কোনো শনিবার তর্ক প্রতিযোগিতা, কোনো শনিবার কুইজ প্রতিযোগিতা।

সন্ধেবেলায় সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা ফুলহাতা জামা, সাদা মোজা ও কালো জুতো পড়ে 'রোল-কল' হওয়ার পর লাইন করে আমাদেরকে 'অ্যাসেম্বলি হলে' ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আর আমরা নির্দিষ্ট কাঠের চেয়ারে বসে পড়তাম। এখনো মনে পড়ে প্রত্যেকটা কাঠের চেয়ারে পিঠ রাখার পিছনের কাটার ওপরদিকে ডিম্বাকৃতি আকারে এস.এস.পি. খোদাই করা থাকত। আর প্রত্যেকটা চেয়ারের নীচে কালো কালিতে লেখা থাকত সেই চেয়ারটার আসল অবস্থান মানে সেই চেয়ারটা কোথায় থাকা উচিত। ভাগ্য ভালো ওইসময় প্লাস্টিকের চেয়ার চালু হয়নি তা নাহলে ওইসব সুন্দর কাঠের চেয়ারে বসার সুযোগ ও পেতাম না।

প্রথমদিকে এইসব লেকচারের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতামও না আর শুনতে মোটেই ভালো লাগত না। কুইজ আর তর্ক প্রতিযোগিতাটা ভালোই লাগত। ওইগুলোতে মনে হত কিছু একটা হচ্ছে আর শুনতে শুনতে ঘুমিয়েও পড়তাম না। বাকিসব বোরিং বক্তৃতাতে পিছনদিকে আমরা ঘুমিয়ে যেতাম আর কখনও বা পাশাপাশি দু-জন বসে কাটাকুটি, শব্দ বানানো ইত্যাদি খেলে সময় পার করতাম।

তারপর নির্দিষ্ট সময় পার হলে বেল বাজত আর আমরা ফুর্তিতে লাইন করে ডাইনিং হলে চলে যেতাম ডিনারের জন্য। নিজের মনে কল্পনা করতাম আজ ডিনারের মেনু কী হবে?

গান বাজনা নাটক/ ইন্টারহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

আমাদের স্কুলে প্রতিবছর খেলাধুলার পাশাপাশি গান বাজনার ও অনুশীলন হত। নির্দিষ্ট সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্ররা নিজেদের হাউসের হয়ে অনুষ্ঠান পেশ করত সবার সামনে।

সেই সময়গুলো আমাদের মনটা বেশ ভালোলাগার একটা রেশ লেগে থাকত। প্রত্যেক হাউসের জন্য একটা দিন বরাদ্দ থাকত যেদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই হাউস স্কুল অডিটোরিয়ামে নিজেদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করত। তারজন্য রীতিমতো রিহার্সাল হত। রিহার্সালে পার্ট নিতে পারলে অনেক কিছুই মাফ হয়ে যেত, যেমন পরেরদিন সকালে পি.টি.!

অডিটোরিয়ামটা ছিল স্কুল বিল্ডিঙের একপ্রান্তে ঠিক আর্ট, ক্র্যাফ্ট ক্লাসরুম পার করে কিছু গাছপালা থাকা অস্থায়ী রাস্তা পার হয়ে। লম্বা একতলা একটা হলঘর যার ওপরে টিনের আচ্ছাদন। যারজন্য বাইরে বৃষ্টি পড়লে অডিটোরিয়ামে খুব জোরালো আওয়াজ হত। সেই হলঘরের একপ্রান্তে একটা উঁচু স্টেজ ছিল যেটাতে রঙিন কার্টেন ছিল সামনে। কার্টেনটা হাত দিয়ে টানতে হত। সেই স্টেজের পিছনে ছোটো একটা গ্রিনরুমও ছিল। স্টেজের উলটোদিকে সারিসারি চেয়ার রাখা থাকত দর্শকদের

বসার জন্য। প্রথম রো-তে এক লাইন সুন্দর দেখতে সোফা সাজানো হত যেখানে স্কুলের প্রিন্সিপাল, হেডমাস্টার, রেজিস্টাররা পরিবার-সহ বসতেন দর্শক হিসেবে। আর সামনে বসতেন গোটা প্রোগ্রামের যারা বিচারকের ভূমিকা নিতেন।

সেই অডিটোরিয়ামে ঢোকার রাস্তা ছিল উলটোদিকে এক ঢাউস মার্কা দরজা। অনুষ্ঠানের দিনে সেই ঢোকার দরজা থেকে স্টেজ অব্দি যে যার নিজের মতো অডিটোরিয়ামটাকে সাজাত বিয়েবাড়ির মতো। ঠিক সাতটার সময় ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়ে যেত।

বেশ কিছুদিন রিহার্সাল দেওয়ার পর অংশগ্রহণকারীরা যে যার শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স দেখানোর চেষ্টা করত। আমরাও নতুন কিছু দেখার জন্য কৌতূহল নিয়ে অডিটোরিয়ামে নিজেদের সিটে বসে থাকতাম। শেষ পর্যায়ে থাকত একাঙ্ক নাটক যেটা মোটামুটি একঘণ্টায় শেষ হয়ে যেত। আমাদের স্কুল যেহেতু ‘বয়েজ স্কুল’ ছিল কোন ছাত্রী ছিল না যারজন্য নাটকগুলোও এমন নেওয়া হত যেটাতে কোনো স্ত্রী চরিত্র থাকত না। কিন্তু সবসময় কী সেই নিয়ম চলে। মাঝে মধ্যে ভালো নাটকে কিন্তু একটা বা দুটো স্ত্রী চরিত্র থাকত তখন সেই নাটকই নামানো হত কিন্তু কোনো ছেলে তখন মেয়ের ‘মেকআপ’ নিয়ে রোলটা করত। নাটক শেষ হওয়ার পরে সেই মেয়ের ‘মেকআপ’ নেওয়া ছেলের অবস্থাটা হত খুব করুণ। সবাই তাকে ঘুরে ঘুরে দেখত, ঠাট্টা ইয়ার্কি

করতেও ছাড়ত না। আর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তার গায়ে একটা মেয়েলি লেবেল লেগে যেত। ওই কৈশোরের সন্ধিক্ষণে সেই গন্ধটা হজম করা সত্যিই খুব কষ্টকর ছিল।

নাটক সাধারণত বাংলা বা ইংরেজিতে হত। তারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য নাটক যেগুলোর স্মৃতি এখনো মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেইগুলো হল—তেপান্তরের মাঠ, মারীচ সংবাদ (নাট্যকার মনোজ মিত্রের লেখা), ইংরেজি নাটক 'দ্যা সেন্টিনেল', 'মারচেন্ট অফ ভেনিস'...আরোও অনেক।

টেগোর হাউস 'মারীচ সংবাদ' নাটকটা পরিবেশন করেছিল। সবথেকে অভিনব ছিল যে নাটকের সূত্রধর এক মাদারি ডুগডুগি বাজিয়ে স্টেজের উলটোদিক থেকে দর্শকের পিছন দিক থেকে ডাইলগ দিতে দিতে স্টেজে উঠে আসে। তখনকার দিনে সেটা ছিল নতুন জিনিস আর সঙ্গে সেই মাদারির অভিনয় ছিল দুর্দান্ত। সেই অভিনেতা ছিল আমাদের সহপাঠী অলোক। অলোক খুব সুন্দর অভিনয় করেছিল সেদিন। সেই নাটকে আমারও একটা খোঁড়ার রোল ছিল আর সেই রোলটা করার পরেই পরের বছর আমার প্রমোশন হয়েছিল 'স্কুল ড্রামা' টিমে।

সেরকম ইংলিশ 'ড্রামাতে' যার নাম মনে পড়ে সে হল আমাদের সহপাঠী অরিন্দম মিত্র। সে এখন পৃথিবীর অপরপ্রান্তে অনেক উচ্চতায় বসে আছে। সে নিশ্চয় ওই নাটকের কথা ভুলে

গেছে। আর আমরা সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে অতীতের মজা নিচ্ছি!

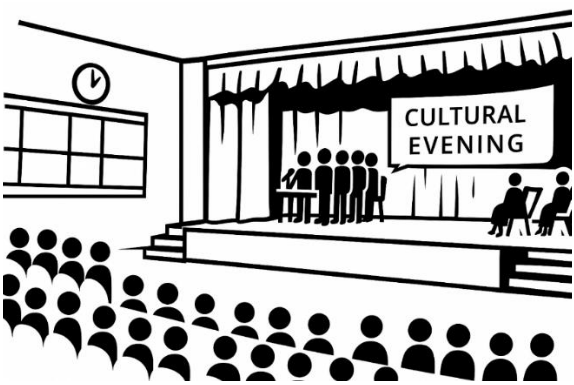

চিত্তরঞ্জন হাউসের একটা নাটকের কথা এখনো চোখের সামনে ভাসে সেটা হল—'তেপান্তরের মাঠ'। এই নাটকে অনেকগুলো চরিত্র ছিল তারমধ্যে আমাদের আর্টিস্ট সুকান্ত একটা দুর্দান্ত রোল করেছিল 'রামগরুড়ের ছানা'। সেই নাটক চলাকালীন কারেন্ট চলে গিয়ে স্টেজের সব লাইট 'অফ' হয়ে যায়। তখন সুকান্ত একটা হ্যাজাক/পেট্রোম্যাক্স ভিতর থেকে এনে স্টেজে রেখে অলিখিত ডায়ালগ দিয়ে সুন্দর মেক-আপ করে ওই অন্ধকার স্টেজকে। সেদিন সবাই তার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করে। এসব ছোটোখাটো ঘটনা মনে খুব দাগ কেটে যায় আর পিছন ফিরে দেখলে খুব আনন্দ দেয়। 'স্মৃতি সততই সুখের'!

ঠিক সেইরকম একটা পারফেন্স ছিল তিলক হাউসের যেখানে একজন স্টেজের উলটোদিক থেকে গান গাইতে গাইতে

স্টেজে উঠে আসে। সেই গান ও অভিনয় ছিল বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা 'উপকার' সিনেমার অভিনেতা প্রাণের। যেখানে সে খোঁড়া ছিল আর একটা ক্রাচের সাহায্যে গানটা গেয়েছিল, মান্না দে-র গলায়, 'কসমে ওয়াদে প্যার বাফা সব...' সেদিন সেই গান ও অভিনয় সবার মন কেড়ে নিয়েছিল। সেইজন্যই তো আজও সেই স্মৃতি চোখের সামনে ভাসছে।

আমাদের সৈনিক স্কুলে কিছু ছাপমারা গায়ক ছিল। তারমানে যারা প্রথম থেকে গান গাইল তারাই স্কুলের শেষদিন অব্দি গেয়ে গেল। এই একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল বাকি কো-ক্যারিকুলার প্রতিযোগিতাগুলোতেও।

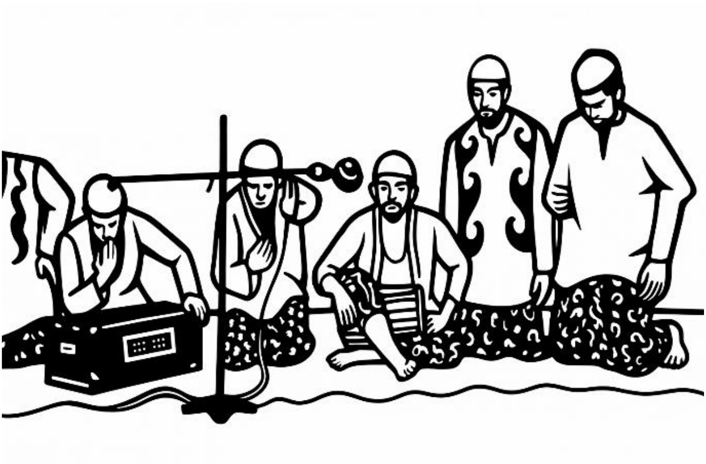

যাইহোক, ভাগ্যক্রমে আমাদের ব্যাচের দু-জন গায়কই টেগোর হাউসে ছিল। শুভাশীষ, সে আবার হারমোনিয়াম বাজাতে

জানত, রীতিমতো রেওয়াজি গলা। আর একজন অলোক যে রেওয়াজ ছাড়াই ভালো গাইত, ঈশ্বরপ্রদত্ত!

মাঝে মাঝে কেউ-বা ‘স্কিট’ (ব্যাঙ্গাত্মক উপহাসমূলক ছোটো নাটক) পরিবেশন করত। এটা আমরা সবাই খুব ফুর্তি করে উপভোগ করতাম।

অনুষ্ঠানের মধ্যে সমবেত সংগীত, একক সংগীত, গ্রুপ ড্যান্স, কাওয়ালি সবরকম পরিবেশন হত। তখন তো টিভি, মোবাইল ছিল না যারফলে শোগুলোও দেখতে পাওয়া যেত না। আমাদের কাছে ওইসব প্রোগ্রামই মন ভালো রাখার রসদ জোগাত।

ওইসব নাটক করার পর আমার নাটকের প্রতি ভীষণ আগ্রহ জন্মাল। তারপর ক্লাস টুয়েলভ পাস করে বাড়িতে গিয়ে

আমি তো পেশাদারি নাটকের গ্রুপে নাম লিখিয়ে ফেললাম। সেই গল্প আর একদিন করা যাবে।

আমার মতে টিভি, মোবাইল না থাকার ফলে আমাদের জীবনটা সত্যিই অনেক সহজ সরল ছিল।

তারপর বিয়েও করলাম ও ডাক্তার হওয়ার পর রোজই নাটক করতে হচ্ছে, প্রতিদিন অভিনয় করে চলেছি! জানি না কবে এই রঙ্গমঞ্চ থেকে অভিনয় জীবন শেষ হবে।

পেরেন্টস্ ডে

আমাদের সৈনিক স্কুলে বছরের কিছু নির্দিষ্ট দিনে বাড়ির লোকেরা এসে দেখা করতে পারত। সেই দিনগুলোকে পেরেন্টস্ ডে বলা হত। সাধারণত সেই পেরেন্টস্ ডে-গুলো রোববারে হত। সেদিন অনেকের বাবা-মা আসতেন আর সঙ্গে আনতেন ছেলের জন্য হরেকরকম খাওয়া। সেদিন সকাল থেকেই পেরেন্টসদের আসা শুরু হয়ে যেত। তারা এসে নিজের নিজের ছেলেদের নিয়ে হোস্টেলের বাইরে ‘ডি’ আকারের উঁচু বাঁধানো বারান্দাতে বসত। অনেক মায়েরা আবার নিয়ম ভেঙে রুমে ঢুকে ছেলের ওয়ার্ডোব গুছিয়ে দিত।

অনেক বাবারা আবার ছেলেকে বুঝতে না পারা পড়া বুঝিয়ে দিত। অনেকে সেই অল্প সময়ের মধ্যে ছেলের অঙ্কও করেও দিত আবার বুঝিয়েও দিত। সেইসব দেখলে সাময়িকভাবে আমার খুব হিংসে হত।

আমার মতো কয়েকজন বন্ধু যাদের কোনোদিন ঘরের থেকে কেউ আসত না তারা দূর থেকে অন্যের মা-বাবার সান্নিধ্য নিতাম। গোটা স্কুল জীবনে আমার বাড়ির থেকে কেউ পেরেন্টস্ ডে-তে আসেনি। আসলে আসতে পারেনি, আসা সম্ভব হয়নি। আমার মতো অন্যদেরও নিশ্চয় অন্য কোনো সমস্যা ছিল।

বিকেলে যখন বাড়ির লোকেরা ফিরে যেত তখন সেইসব বন্ধুরা ম্লানমুখে রুমে ফিরত। আর আমরা সেই সুযোগে তার বাড়ির থেকে আনা খাদ্য ভাণ্ডারে ভাগ বসাতাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাওয়া বলতে থাকত বিস্কুট, নারকেল নাড়ু কিংবা বাদাম বা চানাচুর। সবাই ভাগ করেই খেত আর কিছু অংশ জমিয়ে রাখত পরে খাবে বলে। আমাদের সঙ্গে একজন ছিল যার নাম ছিল চন্দ্রদেও চৌবে যে ছুটির পর আসার সময় বাড়ি থেকে অনেক খাবার আনত আর লুকিয়ে রাখত পরে একা খাবে বলে। তার খাবার জিনিসগুলো আবার একটু অন্যরকমের সাধারণ বিস্কুট চানাচুর নয়। সে আনত কাজু, খেজুর, আখরোট, ছোলা ইত্যাদি। আমরা বুঝতেও পারতাম না কোথায় কোন সময়ে সে লুকিয়ে খেয়ে নিত। তার এক রুমমেট কিন্তু লক্ষ করেছিল, যে সে কোথায় রাখে, কখন খায়। সে তার খাওয়ার জিনিসগুলো ট্রাঙ্কে তালা মেরে রাখত আর সেই তালার চাবি নিজের পৈতের সঙ্গে বেঁধে শরীরের সাথে লটকে রাখত। সেই চাবিযুক্ত পৈতে দিনে একবারই খোলা হত ঠিক স্নানের আগে পায়খানা করার সময়। ওই সময় সে বালিশের নীচে লুকিয়ে রেখে যেত তারপর একসাথে পায়খানা, স্নান সেরে ফিরে আসত।

এমনিভাবেই চলছিল তার খাওয়ার লুকানো অভিযান।

আমরা যখন সবে ক্লাস ইলেভেনে উঠেছি তখন চন্দ্রদেও চৌবের রুম মেটের খুব ইচ্ছে গেল তার ট্রাঙ্ক খুলে ভিতরে রাখা

লোভনীয় খাবারগুলো আত্মসাৎ করা। আর এটা তো মামুলি চুরিচামারি ছিল না। সেটা ছিল একটু রবিনহুড কায়দায় ডাকাতি। পরিকল্পনামাফিক কয়েকজন মিলে তাক করে ছিল যে কখন চন্দ্রদেও চৌবে পৈতে খুলে স্নান করতে যাবে আর তারা তাদের অভিযান সার্থক করবে। ঠিক সময়ে সেই বন্ধু স্নানে গেল আর তারা পাহারা দিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে সব খাবার জিনিস হাতিয়ে নিল। চন্দ্রদেও চৌবে টেরও পেল না। সেবার খাবারগুলো খুব ভালো ভালো উচ্চমানের ছিল। বাদাম, কাজুবাদাম, ছোলা, খেজুর ইত্যাদি। প্রথমে সেই বন্ধুরা সেগুলোকে নিজেরা পেটভরে খেল। সেই কৈশোর বয়সে পেটের খিদেও ছিল জ্বলন্ত উনুনের মতন। তারপর বাকি জিনিসগুলো নিয়ে কী করা যায়? হঠাৎ মাথায় এল যে এগুলো যদি ক্লাসের সবাইকে তাদের অজান্তে গিফ্ট হিসেবে দিয়ে দেওয়া যায় তবে সবাই ফুর্তি করে খাবে আর দাতাদের (চোরেদের?) আশীর্বাদ দেবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যানমাফিক কাজ হল। আমাদের ক্লাসের সবার নির্দিষ্ট ডেস্কে একটা কাগজের ওপর প্রসাদের মত সেই কাজুবাদাম, খেজুর রাখা হল। আমরা পরেরদিন সকালে পি.টি.-র পরে ক্লাসে গিয়ে দেখি ডেস্কের ওপরে পড়ে আছে সেই প্রসাদ। সকাল সকাল খিদের মাথায় আমরা গোগ্রাসে গিললাম আমরা দাতাকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। অনেকে ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে অজানা দাতাকে 'ধন্যবাদ' লিখে জনাল।

গল্পটা যদি এখানেই শেষ হত তাহলে হয়তো ভালোই হত। কিন্তু সেদিন সন্ধে অব্দি সব ঠিকই ছিল কিন্তু রাত্রের খাওয়ার পর প্রেপে যখন চন্দ্রদেও চৌবে এল তখন তার চোখ মুখ গম্ভীর, অবিচল। আসলে সেদিন সকাল থেকেই সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। তারপর তখন রাত্রি দশটা হবে সে একা একা ক্লাস থেকে বেরিয়ে শর্টকাটে হোস্টেলে যাচ্ছিল মিল্কব্রেকের রাস্তা দিয়ে। যখন অন্য একজন বন্ধু হোস্টেলে ফিরছিল তখন সেখানে চন্দ্রদেওকে শুয়ে থাকা দেখা গেল। বন্ধুটা এসে আমাদেরকে কথাটা জানাল। আমরা গিয়ে সেই জায়গা থেকে অর্ধচেতন চন্দ্রদেও চৌবেকে উঠিয়ে স্কুলের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

আমাদের স্কুলের হাসপাতালটা একটা ছোটো মেডিক্যাল ইউনিট যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা ফার্মাসিস্ট থাকত আর পার্ট টাইম ডাক্তার সপ্তাহে তিনদিন আসতেন। সুতরাং চন্দ্রদেওকে নিয়ে গেলাম ঠিকই কিন্তু শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পরের দিন ডাক্তার না আসা অব্দি অপেক্ষা করতে হল তার রোগটা কী ধরার জন্য। আর চন্দ্রদেও পরের দিন সকাল থেকে অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে লাগল। কখনও বলে পুকুরে যাবে, পুকুরে নিয়ে গেলে বলে ঝাঁপ মারবে। আর আমরা পালা করে তাকে পাহাড়া দিতে থাকলাম যাতে কোনো অঘটন কিছু না ঘটে। আমরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ডাক্তার আসা অব্দি রোগীর আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকলাম। পরের দিন ডাক্তারবাবু এসে দেখে ওষুধপত্র দিলেন কিন্তু খুব

একটা গুরুত্ব দিলেন না। আর রোগী দেখা চিত্রগুপ্তের বিরাট খাতাটাতে (Medical Record book) যথারীতি রোগের নাম আর ওষুধের নাম লিখে চলে গেলেন।

এদিকে আমরা তো উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছি যে চন্দ্রদেও-য়ের হঠাৎ করে কী রোগ হল। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলবশত ঝুঁকি নিয়ে সংগোপনে সেই চিত্রগুপ্তের খাতাটায় কি লেখা আছে দেখলাম। দেখি চন্দ্রদেও-য়ের নামের পাশে লেখা আছে 'Malingering'। লেখাটা দেখে কিছু ছাই বুঝতেও পারলাম না। অনেক অসুখের নাম শুনেছি কিন্তু এইরকম বিদঘুটে অসুখের নাম কস্মিনকালেও শুনিনি। সুতরাং লাইব্রেরিতে এসে ডিকশনারি খুলে তার মানে দেখতে পেয়ে আমরা আনন্দে আটখানা। তার মানে এটা আদৌ কোনো রোগ নয়। সে রোগের অভিনয় করছে। আমাদের ও চিন্তা উদ্‌বিগ্নতা কমে গেল। কাজুবাদামগুলো আগেই হজম হয়ে গিয়েছিল এখন আর মনে কোনো অপরাধ বোধ থাকল না সেটাও হজম হয়ে গেল।

তারপর চন্দ্রদেও যদিও ওষুধপত্র খেল কিন্তু সে স্বাভাবিক অবস্থায় আর ফিরে এল না। তখন তার বাড়িতে খবর দেওয়া হল। ঘরের লোকেরা এসে চন্দ্রদেওকে বাড়িতে নিয়ে গেল। আমরাও ব্যস্ত হয়ে গেলাম ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষার জন্য। চন্দ্রদেওকে সবার মনে পড়ত ঠিকই, কিন্তু সে যে কী করছে কী অবস্থায় আছে কেউ জানত না। হঠাৎ ফাইনাল পরীক্ষার

কয়েকদিন আগে সে স্কুলে ঘুরে এল, আবার হোস্টেলে ঢুকল। কিন্তু এবার তার সঙ্গে আর কাজুবাদাম এল না। চন্দ্রদেও এমনিতেই গম্ভীর প্রকৃতির ছিল আর এই ঘটনার পর আরো গম্ভীর হয়ে গেল। সে আসার পরে তাকে আর কেউ ঘাঁটাত না। আর তার কী হয়েছিল কীভাবে ভালো হল জিগ্যেস করার সাহসও করত না। একদিন চন্দ্রদেও নিজেই বলল যে তার ব্রেনে ধরেছিল। সে পাটনাতে বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে দেখানোর পর সুস্থ হয়েছে কিন্তু ডাক্তাররা তাকে মানসিক চাপ নিতে মানা করেছে। আমরাও ছাড়বার পাত্র নই, কথাপ্রসঙ্গে সে ডাক্তারদের একগাদা প্রেসক্রিপশন দেখাল। তার মধ্যে শেষের প্রেসক্রিপশনটা সাইকিয়াট্রিস্টের ছিল। বেশিরভাগ ওষুধই ছিল ভিটামিন আর টনিক। সব Placebo হিসেবে কাজ করেছে। তার মানে আমাদের স্কুলের ডাক্তারের 'Malingering' ডাইগনোসিস ঠিকই ছিল।

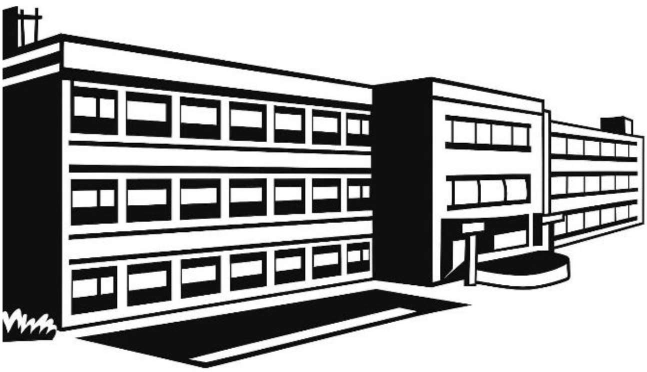

পরবর্তীকালে আমি ডাক্তার হয়েছি তাও আবার সাইকিয়াট্রিস্ট হয়েছি। এখন আমি জানি যে ‘Malingering’ এক ধরনের সাইকিয়াট্রিক বা মনের অসুখ। এই রকম অনেক রোগী এখন আমার কাছে আসে আর আমি যতবার তাদের দেখি ততবার মনে পড়ে সেই চন্দ্রদেওয়ের ঘটনাটা। কিন্তু সেই ‘Malingering’ কেসে সেটাই ছিল হাতেখড়ি।

চিলেকোঠা

আগের দিনে প্রত্যেকটা পাকা বাড়িতে সিঁড়ি ও ছাদ থাকলে ওপরতলায় একটা চিলেকোঠা থাকত। ঘরের সিঁড়ি যেখানে গিয়ে শেষ হত তার ওপরটায় ঢাকা না থাকলে সেখান দিয়ে বৃষ্টির জল আসত। সুতরাং তার ওপরটা ঢাকলে পরে পাশে একটা রুম বার হয়ে যেত। এখন সব জায়গায় ফ্ল্যাট হওয়ার ফলে ‘চিলেকোঠা’ উধাও হয়ে গেল। কৈশোর ও প্রাক্ যৌবনকালে এই ‘চিলেকোঠা’ জিনিসটা ছিল বড়ো লোভনীয় আকর্ষনীয় জায়গা। বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখকের লেখায় এই চিলেকোঠাতে যুবক-যুবতীর অনেক কাণ্ড ঘটেছে। সাধারণত যৌথ পরিবারে বেশি সদস্য থাকলে বেকার যুবকদের নির্ভৃতে থাকার এটাই ছিল আদর্শ জায়গা।

আমাদেরও এইরকম চিলেকোঠাতেই হয়েছিল প্রথম সিগারেট বিড়ি খাওয়ার হাতেখড়ি। প্রেমপত্র লেখার, কবিতা লেখার, গিটার শেখার, বাঁশি শেখার আদর্শ জায়গা। কোনো বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে এই চিলেকোঠাতেই আমরা আড্ডা দেওয়া পছন্দ করতাম। ওখানেই যত রাজ্যের নিষিদ্ধ বই, নিষিদ্ধ কাজ করা হত। ‘চিলেকোঠা’ মানেই যেন এক অন্য জগতের হাতছানি।

আমরা যখন সৈনিক স্কুলে গেলাম সেখানে হোস্টেলটা তিনতলা ছিল। প্রত্যেকটা ফ্লোরে তিনটে করে রুম ছিল।

একদিকে মেইন চওড়া সিঁড়ি ছিল, উলটোদিকে বাথরুম, একটা স্টোর রুম যেটাকে আমরা 'ট্রাঙ্ক রুম' বলতাম। ঠিক তার পাশেই কর্নারে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ছিল যটাকে আমরা Spiral staircase বলতাম। সেই স্টোর রুম সবসময় খালিই থাকত, মাঝে মাঝে ওয়ার্ডেন এসে বসতেন। আর আমাদের স্কুলের গরম বন্ধ, শীতের বন্ধ, পুজোর বন্ধ হলে আমরা আমাদের ট্রাঙ্কে সব জিনিসপত্র ঢুকিয়ে তালা মেরে ওই ট্রাঙ্করুমে ঢুকিয়ে দিতাম। ওই রুমটা ওয়ার্ডেন তালা মেরে দিত যেটা খোলা হত বন্ধের পরে স্কুল খুললে। আমাদের মতো জুনিয়র ছেলেদের পাশের ঘোরানো সিঁড়িটা ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। তার দরজাটা বন্ধ থাকত আর ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে ভাবতাম যে এই সিঁড়িটা কেন বানানো হয়েছে? এটা যদি ব্যবহার করা নিষেধ তবে এটার কাজ কী? পরে জেনেছিলাম যে এটা ইমারজেন্সি সিঁড়ি, এই রাস্তা দিয়েই জমাদারদের বাথরুম পরিষ্কার করতে আসা উচিত। আর হঠাৎ কোনো ইমারজেন্সি অবস্থায় যেমন আগুন লাগলে ইত্যাদি সময়ে এই সিঁড়িটা ব্যবহার করা হবে।

কয়েক বছর যাবার পর মাঝে মাঝে দেখতাম দরজাটা খোলা। একদিন সাহস করে অন্ধকারে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম সোজা চিলেকোঠায়। ওটাকে বলা হত 'এটিক' যেটা ছিল আমাদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। চিলেকোঠায় উঠতেই আলো দেখলাম কিন্তু ছাদে যাওয়ার রাস্তাটা ছিল বন্ধ। সেদিন ঘুরে

এসেছিলাম কিন্তু কৌতূহলটা থেকে গিয়েছিল। আমরা যখন বিকেলে স্নান করতাম তখন মাঝে মাঝে কলে জল চলে যেত। জল চলে গেলে প্রথমে ওপর তলায় যেত আর আমরা কয়েকজন তাড়াহুড়ো করে সাবান মাখা অবস্থায় তোয়ালে নিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে যেতাম স্নান করতে।

আস্তে আস্তে পরের দিকে সেই চিলেকোঠা, ঘোরানো সিঁড়ি আর নিষিদ্ধ থাকল না। সেটাতে যাওয়ার রাস্তার তালা খোলায় থাকত আর আমরাও নিজের খুশিমতো আসা যাওয়া করতাম। একজন সিনিয়র দাদা আবার ছুটির দিনে সেই চিলেকোঠায় গিয়ে নিভৃতে পড়াশোনা করতে যেত। কতটা পড়াশোনা হত জানি না কিন্তু সবার সঙ্গে একটা দুরত্ব তৈরি হত ঠিকই।

আমরা সিনিয়র হওয়ার পর অনেক কিছুর হাতেখড়ি হয়েছিল সেই চিলেকোঠায় গিয়ে। তারমধ্যে একটা হচ্ছে

সিগারেট খাওয়া। আমাদের ক্লাসের পাগলা দাশু এই চিলেকোঠায় অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করত। যেমন নাগা বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন জিনিস রান্না করে জিভের স্বাদ নিত। সেখানে সবার গোপনে কাঠবিড়ালির মাংস, ছোটো মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি রান্না করত সেই চিলেকোঠায়। এমনকী সবার অজান্তে ছোটোখাটো জীবজন্তু কিছু পুষে রাখত। আর কিছুদিন পর অযত্নে না খেতে পেয়ে তাদের মৃত্যু হত।

ক্লাস নাইনে আমাদের সঙ্গের এক বন্ধু এন.সি.সি. ক্যাম্পে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। তারপর সেই পাগলা দাশুর শখ গেল প্ল্যানচেট করে মৃত বন্ধুর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিন্তু এইসব করতে হলে তো নিরালা জায়গা লাগবে। সুতরাং হোস্টেলে সেই নিরালা জায়গা বলতে একটাই, সেই চিলেকোঠা।

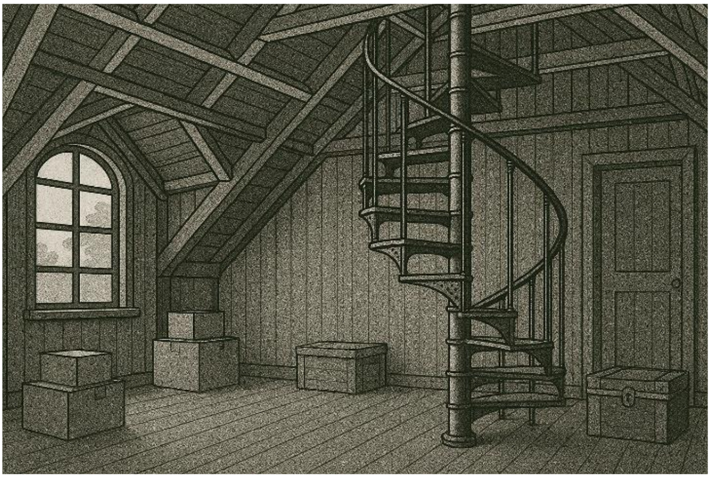

একবার গরমের বন্ধে আমাদের বাড়ি যাওয়ার কয়েকদিন বাকি ছিল। হোস্টেলের পরিবেশ একটু ঢিলেঢালা তখন সবাই মিলে প্ল্যান করে সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে চিলেকোঠা পার হয়ে ছাদে প্ল্যানমাফিক তোষক নিয়ে গিয়ে সবাই রাত্রে ঘুমালাম। সকালবেলায় যুদ্ধ জয় করার মতো ফিরে এলাম।

এখন আর বাড়ির চিলেকোঠা বিশেষ চোখে পড়ে না। থাকলেও তার আর কদর নেই। আগে বড়ো যৌথ পরিবারে সেই চিলেকোঠা একটা উপরি ঘর হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু এখন সব ফ্ল্যাট বাড়িতে যৌথ পরিবারও নেই আর চিলেকোঠাও নেই।

পাগলা দাশু

ছেলেবেলায় প্রত্যেক ব্যাচেই বোধহয় একটা করে পাগলা দাশু থাকে। যাকে নিয়ে মজা মশকরা, জল্পনাকল্পনা সবসময় চলতে থাকে। বড়ো হওয়ার পর তাদের কথা মনে পড়লে খুব আশ্চর্য লাগে। এখনকার প্রজন্ম মনে হয় এদের কাজ কারবারকেই lateral thinnking কিংবা out of the box thinking বলে। তারমানে 'পাগলা দাশু' আগেও ছিল এখনও আছে।

আমাদের ক্লাসে যে ছিল সে ছিল শ্যামলা, পাতলা, রোগা, মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করত। সে যে কাউকে দেখানোর জন্য করত বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য করত সেটাও নয়। এটা ছিল তার ভিতর থেকে নতুন কিছু করার প্রবণতা। একবার সে লম্বা একটা সাপ মেরে তার চামড়াটা নুন দিয়ে সুন্দরভাবে শুকিয়ে একটা বেল্ট তৈরি করল। প্যান্টের ওপর পড়লে হলুদ আর সাদা ছোপছোপ সাপের চামড়াটা প্রকট হয়ে দেখা দিত মনে হত কোমরে যেন সাপ পেঁচানো আছে। তখন ছিল সত্তরের যুগ। সম্ভবত পঁচাত্তর হবে। এখনকার দিন হলে যে কোনো ফ্যাশন ডিজাইনার লুফে নেবে সেই ডিজাইন। কিন্তু তখনকার দিনে সবাই এটাকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখেছিল।

একবার আমরা সৈনিক স্কুল থেকে স্কুল বাসে দীঘা গিয়েছিলাম বেড়াতে। সমুদ্র সৈকতে খুব আনন্দ করার পর আমরা আবার বাসে করে টুকটাক জিনিস নিয়ে ফিরে এলাম। আমরা নিয়ে এলাম যেমন ঝিনুক, শঙ্খ ইত্যাদি। কিন্তু সেই পাগলা দাশু সবার অজান্তে বাসের মাথায় একটা জ্যান্ত বেঢপ সাইজের কচ্ছপ নিয়ে চলে এল স্কুলের হোস্টেলে। জ্যান্ত কচ্ছপ উলটো করে দিলে চলাফেরা করতে পারে না একই জায়গায় থেকে যায়। কথাটা সেদিনই জেনেছিলাম পাগলা দাশুর দৌলতে। ফিরে এসে সেই বিরাট কচ্ছপটাকে বেশ কিছুদিন পুষে রাখল হোস্টেলের চিলেকোঠায়। তারপর সেটা নিজে নিজে মরে গেল না সেটাকে মেরে তার মাংস সদ্ব্যাববহার করা হল সেটা ঠিক মনে নেই। তবে যেটা মনে আছে সেটা হল সেই কচ্ছপের শক্ত মাথার খুলিটাকে সে অ্যাশট্রে বা ছাইদানি বানাল আর শরীরের শক্ত খোলসটা সুন্দর করে সাজিয়ে নিজের রুমে রেখে দিল।

পাগলা দাশু একবার কয়েকজন বন্ধুকে সাথে জুটিয়ে চুপিসারে ব্যাং মেরে তার মাংসের স্বাদ নিল। স্কুলের হোস্টেলে যেখানে দেশলাই কাঠি রাখাই দণ্ডনীয় অপরাধ সেখানে সে ইঁট দিয়ে উনুন বানিয়ে ছোটো ছোটো কাঠের টুকরো, খাতার পাতা জ্বালিয়ে সেই ব্যাঙের মাংস রান্না করেছিল।

ক্লাস নাইন টেনে পড়ার সময় সে নাটকে খুব ভালো অভিনয় করতে লাগল। তার প্রথম নাটক ছিল ‘তেপান্তরের

মাঠে’। সে ফাটাফাটি অভিনয় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। তারপর প্রতি বছর নাটক প্রতিযোগিতায় তার রোল পাকা হয়ে গেল। স্কুল গ্রুপেও নাটকে তার সুযোগ মিলল। একদিন সে আমাকে বলল সে টুয়েলভ পাশ করে ‘ন্যাশানাল স্কুল অফ ড্রামা’-তে পড়াশোনা করবে। সেই অদ্ভুত কল্পনা শুনে আমিও সেদিন স্বপ্নের জাল বুনতে লেগেছিলাম।

ওইসময় কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমরা যখন সবে সিগারেট খাওয়া শিখছি তখন সেই পাগলা দাশু অদ্ভুত এক কাণ্ড করত। দেশলাই কাঠিটা জ্বালিয়ে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিত তারপর তৎক্ষনাৎ মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে ধোঁয়াটা টেনে দেশলাই কাঠিটা ফেলে দিত আর মুখ থেকে সেই টানা ধোঁয়াটা গলগল করে বার করত। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখতাম কিন্তু অনুকরণ করতে সাহস পেতাম না। কখনো-বা করলেও সেইরকমভাবে ধোঁয়া বার হত না।

একবার স্কুলে তখন আমরা এইট নাইনে পড়ি। হঠাৎ একদিন সকালে খবর পেলাম আমাদের স্কুলের বাউন্ডারির শেষ সীমানায় একটা বেওয়ারিশ ডেডবডি পাওয়া গেছে। ওই বয়সে তখনও আমরা কোনোদিন বেওয়ারিশ মরা লাশ দেখিনি। ভীষণ কৌতূহল হল শেষ সীমানায় গিয়ে লাশটাকে দেখা। এদিকে কানাঘুষোয় শুনলাম সবাই যেতে মানা করছে, এসব বেওয়ারিশ লাশ দেখতে যাওয়া মানে পুলিশের কবলে পড়ে জেরার সম্মুখীন

হওয়া। কিন্তু ওই বয়সে কৌতূহলের কাছে আমরা হার মানলাম এবং সরেজমিনে দেখতে গেলাম।

কিন্তু আমাদের পাগলা দাশু একা একা গিয়ে সে ওই লাশটার স্কেচ আঁকতে লাগলো কেন-না আমাদের আর্ট টিচার বলেছিল মরা মানুষের স্কেচ করার সুযোগ এর থেকে আর ভালো পাওয়া যাবে না। ভয় ডর ছাড়া পাগলা দাশু বিকেল অব্দি বসে স্কেচ এঁকে চলল।

পাঠকরা নিশ্চয় ভাবছেন যে পাগলা দাশু বড়ো হয়ে কী হল! নাটক করার জন্য অভিনয় জগতে চলে গেল না আর্ট স্কুলে নাম লেখাল? সে কিন্তু এসব না করে ইলেভেন পাশ করে সে এন.ডি.এ.-তে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল আর সেখানেই সে তার ভবিষ্যতের কেরিয়ার গড়ল। প্রথমে সে মেডিক্যাল টেস্টে 'টেম্পোরারি আনফিট' হয়ে যায় তারপর আবার যা করে মেডিক্যাল টেস্টে ফিট হল সে আর এক গল্প। সবাই আর্মি, এয়ার ফোর্সে নাম লেখায় সে কিন্তু নৌবাহিনী মানে ইন্ডিয়ান নেভিতে নাম লেখাল। সেখানে সে পুরোদমে চাকরি করল তারপর মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিটায়ার্ড করে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নতুন করে শিক্ষকতা করতে লাগল। সে কোনো ফাঁকে BTech ও পরবর্তীকালে সাবমেরিনের ওপর MTech করে ফেলেছিল আমরা জানতেও পারিনি। বর্তমানে সে এক নামি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের Dean।

সে কিন্তু ততদিনে নিজস্ব চেষ্টায় আর্টের ওপর অনেক পড়াশোনা করে নিজের ভিতটা পোক্ত করে নিয়েছে। আগে যেটা সে শখে করত সেটাকে প্যাশন হিসেবে নিয়ে ওই লাইনে আরো এগিয়ে গেল। তার সুপ্ত প্রতিভা যেন আরো প্রস্ফুটিত হয়ে বিকশিত হতে থাকল। ততদিনে সে নিজের চেষ্টায় ও অধ্যাবসায়ে পেপার কাটিং দিয়ে কোলাজ তৈরি করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে ফেলেছে। শিল্প জগতে সে তার শিল্পে নিজস্ব এক ধারা তৈরি করেছে। ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিভিন্ন শহরে তার আর্ট এগজিবিশন হতে লাগল আর তার বানানো বড়ো বড়ো ছ-ফুট কোলাজ শিল্পী প্রেমিকরা কিনতে লাগল।

আমাদের পাগলা দাশু শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল হাত-পা ছড়িয়ে থাকার জন্য। সেখানে সে ফুলের গাছ, ফলের গাছ, যাবতীয় তরিতরকারি লাগিয়ে নিজস্ব পৃথিবীতে চিত্ত সুখে শিল্পের সঙ্গে সহবাস করতে লাগল। তার বাগানের জাপানি পুকুরে ছোটো ছোটো রঙিন মাছ ঘোরে। সে আপনমনে স্বাধীনভাবে নিজস্ব চিন্তাধারায় কাজ করে আনন্দে মগ্ন হয়ে সেটাকেই তার জীবনশৈলী বানিয়ে ফেলল। পাগলা দাশু নিজস্ব প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগিয়ে চুপচাপ নিত্যনতুন যন্ত্র বানাতে লাগল। নিজস্ব ওভেন বানিয়ে বেকারির কাজ ঘরেই করল। তার ওভেনের পিৎজ়া আমাদের সঙ্গের বন্ধুরা খেয়ে প্রসংশায় পঞ্চমুখ। তার ঘরের (না হাভেলি?) ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন নিজস্ব বিভিন্ন

শিল্পকলার সংমিশ্রণে এক আলাদা নান্দনিক মাত্রা পেয়েছে। সবথেকে বড়ো কথা যে সব তার নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত ও নিজে হাতে বানানো। সেই খামার বাড়ির (ফার্ম হাউস) চত্বরে নিজের হাতে বানানো বৈঠকখানা দেখে আমি অভিভূত। এইসব তো দূর থেকে ফটো দেখা আর লোকের মুখে ঝাল খাওয়া। পাগলা দাশুর এইসব বর্তমানের কারবার দেখলে মনে পড়ে যায় শান্তিনিকেতনের সেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের কথা। যিনি প্রাকৃতিক উপায়ে নিজস্ব যন্ত্রপাতি বানিয়ে বহাল তবিয়তে বসবাস করছেন।

পাগলা দাশুর এইসব আবিষ্কার হয়তো-বা ভবিষ্যতে কোনোদিন পেটেন্ট পেলে সেইসব যন্ত্র সর্বজনীন হবে। কিন্তু পাগলা দাশুর সেসব তো ধাতে নেই। এবার সে আমাদের কাছে

পাগলা দাশুর থেকে প্রফেসর শঙ্কুতে পরিনত হল যদিও সেটাতে তার কিছু যায় আসে না। সে নির্বিকার হয়ে তার শিল্পে ডুবে থাকে। নিজের ঢাক সে নিজে পেটাবে না যদি কেউ পিটিয়ে দেয় তাহলে আওয়াজ বার হলে হোক!

আমার লেখা তৃতীয় বইটা বার হওয়ার আগে সেই বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য তার কথা মনে এল। যেমন আমার লেখা দ্বিতীয় বইটার প্রচ্ছদও আমাদের স্কুলের ছেলেবেলার বন্ধুর আঁকা। কিন্তু পাগলা দাশুকে যোগাযোগ করায় তো মুশকিল। সে তো মোবাইল ফোনই ব্যবহার করত না তখন। শেষমেষ তার সঙ্গে যোগাযোগ হল আর সুন্দর নামি তার বানানো কোলাজ দিয়ে প্রচ্ছদ দিয়ে আমার বইয়ের খোলনলচে বদলে বইয়ের মান ইজ্জত বাড়িয়ে দিল।

এখন ভাবি ভাগ্যিস সেদিন সে ফোন ধরেছিল তা নাহলে আমার বইয়ের এত সুন্দর উচ্চমানের প্রচ্ছদ কপালে জুটত না।

শনিবারের আড্ডা

স্কুলের হোস্টেলে শনিবার দিনটা বিশেষ কোনো গুরুত্ব পেত না যতদিন না ক্লাস সেভেনে গিয়ে কৈশোরে পা দিয়েছি। রোববার ছুটি থাকত যারজন্য রোববারের জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম একটু বেশিক্ষণ ঘুমানোর জন্য।

কিন্তু শনিবারের মহিমা বুঝলাম তখন থেকে যখন থেকে শনিবার রাত্রে আড্ডা দেওয়া শুরু হল।

শনিবারের রাতের ডিনারটা একটু অন্য রকমের ছিল। ‘ইংলিশ ডিনার’ সেটার মেনু থাকত ব্রেড, ভেজিটেবল স্যুপ, একটা আলুর চপ আর একটা কাটলেট। খাওয়ার শেষে ডেসার্ট কাস্টার্ড কিংবা মিষ্টি। সেই ডিনার খাওয়ার পর সবার মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যেত। সবাই নিজের রুমে বসে আড্ডা জমাত। সেদিন একটু ঢিলেঢালা ভাব থাকত অন্যদিনের মতো ‘লাইট অফ’ করার জন্য কেউ তাড়া দিত না।

আস্তে আস্তে রাতের আড্ডার সময় বাড়তে লাগল। এটাও তো একটা নেশা। শনিবারের আড্ডাটা না হলে ভালো লাগত না। এক একদিন আড্ডা যখন শেষ হত তখন ভোর হয়ে গেছে, পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ শোনা যেত।

সেইরকম আড্ডাতে এক সিনিয়র দাদা এসে ‘কী করছিস’ বলে আড্ডাতে ঢুকে পড়ত আর যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প শোনাত। ওই বয়সে ওইসব গাঁজাখুরি গল্প গোগ্রাসে গিলতাম বুঝতেই পারতাম না কোনটা সত্যি আর কোনটা গাঁজাখুরি গল্প। সেই দাদাটাকে খুব ভালো লাগত। সে আমাদেরকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল, কল্পনার জাল বুনতে শিখিয়েছিল। পরের দিকে সেই দাদা যখন রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে চেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে গল্প শোনাত তখন পিছন থেকে একজন লাটাই গোটানোর মুকাভিনয় করত। যার অর্থ আমাদেরকে ইঙ্গিত করত যে সিনিয়র দাদা যা বলছে সব গাঁজাখুরি গল্প এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দিতে হবে। অনেক সময় সেই সিনিয়র দাদা আমাদের চাপা হাসি দেখে বুঝতে পারত আর বলত, “গোটা গোটা যতখুশি গোটা...”।

ভাগ্য ভালো তখন মোবাইল ছিল না থাকলে সবাই মিলে নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে আড্ডা হত না সবাই একা একা মোবাইলেই ঢুকে থাকত।

শীতের দিনে রাত্রে যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ত তখন আমাদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ হত কেউ বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারলে তাকে শনিবারের রাত্রে ইংলিশ ডিনার থেকে চপ প্রাইজ দেওয়া হবে। একদিন এক বন্ধু ওই ঠাণ্ডা রাত্রে স্নান করে প্রাইজ জিতে নিল।

এইসব ছোটো ছোটো ঘটনাগুলো এখন ভাবলে ভীষণ নগণ্য লাগে। এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা ঘটনাগুলো শুনলে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে। কিন্তু আমরা সেই সবের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেতাম। যারজন্য এইসব ছোটো ছোটো ঘটনাগুলো আজও জীবনের পাথেয় হয়ে আছে মণিমুক্তোর মতো মনের সিন্দুকে এখনও তোলা রয়েছে।

আমাদের আর একটা খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল শনিবারের মাঝরাতে কেউ হোস্টেল পার হয়ে, স্টাফ কোয়ার্টার পার হয়ে পদ্মপুকুরে যেতে পারবে কি না। কেউ রাজি হলে যাওয়ার আগে তাকে সব ভুতের গল্প শুনিয়ে ভয় পাইয়ে দেওয়া হত। ব্যাস! সেও ভড়কে গিয়ে আর যেতে সাহস পেত না।

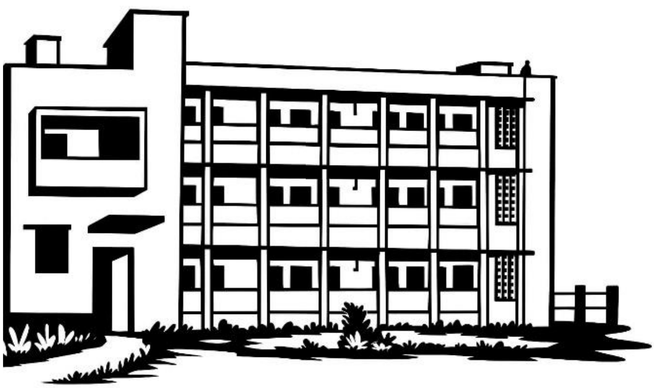

আমাদের স্কুলের ক্যাম্পাস ভীষণ বড়ো ছিল। মাপে মোট তিন-শো চোদ্দো একর হবে। আমাদের হোস্টেলের পিছনে হকি

ফিল্ড তারপরেই শুরু হয়েছে স্টাফ কোয়ার্টার যেখানে আমাদের স্যারেরা থাকতেন। তার পরেই একদিকে ধোবি কোয়ার্টার আর তার উলটোদিকে লম্বা ফ্ল্যাটে স্টাফ কোয়ার্টার। ধোবি কোয়ার্টারের পরেই লোকালয় শেষ। একটু এগিয়ে গেলেই দু-পাশে ধু-ধু মাঠ তেপান্তরের মাঠের মতো। একদিকে মাঠের পরেই পদ্ম পুকুর আর তার দক্ষিণ দিকে এক শিব মন্দির। তার পিছনেই স্কুলের ক্যাম্পাস শেষ আর গ্রাম শুরু। ওই জায়গাটা এমনিতেই খুব নির্জন কেমন যেন গা ছমছম ভাব। রাত্রে একা যাওয়া ভাবাই যায় না।

ওইরকম একদিন খেলা খেলতে গিয়ে অলোক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল ওই অন্ধকারে। আমরাও তাকে বাধা দিলাম না অনেকক্ষণ যখন হয়ে গেছে তখন আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন আমি বার হয়ে ওকে খুঁজতে গেলাম। হোস্টেলের পিছনের মাঠে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু-জনে মিলে রুমে এলাম যেখানে অন্য বন্ধুরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। এবার অলোক যা বলল সেটা তার মুখ থেকেই শোনা যাক।

“আমি মন্দির পার হয়ে পদ্মপুকুর অব্দি গেলাম। ওটাই ছিল আমাদের শেষ সীমানা। প্রথমে একটু ভয় আর গা ছমছম ভাব ছিল কিন্তু পরে সেটা কেটে গেল যখন কোনো ভূত বা প্রেতাত্মার সঙ্গে দেখা হল না। বেশ ফুরফুরে মন নিয়ে ফিরে

আসছিলাম। মনে বেশ আনন্দ হচ্ছিল যে এবার চ্যালেঞ্জটা জিতে যাব। কিন্তু যেই মন্দির অব্দি এসেছি হঠাৎ দেখি অত রাতে একজন লোক চানাচুর বাদাম বিক্রি করার ডালা নিয়ে আসছে। মাথার ওপরে তার ডালাটা যার ওপরে একটা কুপি জ্বলছে আর বগলে হাতেবোনা বাঁশের ডালা রাখার স্ট্যান্ডটা। আমি তাকে দেখে একটু সাহস পেলাম ভাবলাম যাক এই সুযোগে অল্প বাদাম কেনা যাক। লোকটার কাছে এগিয়ে আসতেই তাকে বাদাম দিতে বললাম। সে ডালাটা মাথার থেকে নামিয়ে বগলে রাখা স্ট্যান্ডটায় রাখল তারপর যেই বাদামটা ওজন করছে দেখি তার দুটো হাতের একটাও আঙুল নেই কিন্তু সে ওজন করে চলছে। সেই দেখে আমি ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর দেখি উলটোদিক থকে একজন ধুতি পরে দেহাতি লোক আসছে। আমি তাকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম। কাছে গিয়ে দেখি লোকটার চেহারাটা কালো কুচকুচে, মাথার চুলটা বাবরি করা ঠিক যাত্রাদল কিংবা পেশাদারি কীর্তন করা মানুষের চেহারার মতো। লোকটা নিজের মনে খোশমেজাজে গান গাইতে গাইতে আসছিল। আমি তার কাছে পৌঁছে একটু হাঁফ নিয়ে তাকে গোটা ঘটনাটা বললাম যে একটু আগেই আমি একজন বাদামওয়ালা দেখলাম যার হাত দুটোতে কোন আঙুল নেই কিন্তু সে সব কাজ করে যাচ্ছে। সেটা দেখে আমার খুব ভয় লেগে গেল এখন হোস্টেল অব্দি বাকি রাস্তাটুকু যেতেই ভয় লাগছে। সে সোজা আমার চোখের দিকে তাকাল আর নিজের হাতদুটো

সামনে এগিয়ে জিগ্যেস করল, ‘ক্যাসা বাবু এইস্যা...’ আমি তখন স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার কালো কুচকুচে মুখের থেকে সাদা দাঁতগুলো বার করে সে হাঁসছে আর তারও সেই দুটো হাতের একটা আঙুলও নেই। সেই দেখে আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে সামনের দিকে পড়িমরি করে ছুটলাম। কোনোমতে এতদূর অব্দি পৌঁছেই তোকে দেখলাম।” এই ঘটনা শুনেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটু ধাতস্থ হতেই দেখলাম অলোক বলছে অনেক কিছুই কিন্তু তার মুখ চোখ খুবই স্বাভাবিক। তারমানে কি সে আদৌ না গিয়ে বানিয়ে গল্প বলছে। এমনিতেই অলোক আবার গল্প বানাতে খুব ওস্তাদ।

যাইহোক যা বোঝার সে বুঝল তারপরে আমরা দু-জনে হোস্টেলে ওই আড্ডা দেওয়ার নির্দিষ্ট রুমে গিয়ে গোটা ঘটনাটা আরো রং লাগিয়ে পরিবেশন করলাম।

সবাই খুব ধৈর্য সহকারে শুনল তারপর সুরসুর করে যে যার নিজস্ব রুমে চলে গেল। সবার মুখে চোখে সেদিন ছিল একটা ভয় ও আতঙ্ক। চোখের সামনে সবাই দেখতে পাচ্ছিল যে দুই হাতে আঙুল না থাকা একটা কিম্ভূতকিমাকার মানুষ হাত দেখিয়ে বলছে, 'ক্যাসা বাবু এইস্যা ...'।

তারপর থেকে সেই 'ক্যাসা বাবু এইস্যা...' ডায়লগটা একটা ভয় খাওয়াবার অস্ত্র হয়ে গেল। যখন আলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন সেই ডাইলগটা বলে আমরা খুব হাসাহাসি করতাম। আর পরবর্তীকালে আমাদের ছেলে-মেয়েদের সেই গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলে আসর জমাতাম। সেই উক্তি, 'ক্যাসা বাবু এইস্যা...'

বক্সিং খেলা

বক্সিং খেলা নামটা শুনেছিলাম কিন্তু কীভাবে খেলে জানতাম না। সৈনিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর দশ বছর বয়সে প্রথম চোখের সামনে বক্সিং খেলা দেখলাম। আমাদের স্কুলে একটা বক্সিং রিং ছিল যেটা বছরের বেশিরভাগ সময় অকেজো হয়ে পড়ে থাকত। ঠিক বক্সিং খেলা প্রতিযোগিতা হওয়ার কয়েকদিন আগে জায়গাটা পরিষ্কার করে নতুন করে সাজানো হত। বক্সিং রিংটা একটা উঁচু স্কোয়ার প্ল্যাটফর্মের ওপর ছিল। ওঠার জন্য দু-পাশে দুটো সিঁড়ি ছিল যেটা দিয়ে বক্সিং খেলার জন্য খেলোয়াড়রা উঠত। তার ওপরে দড়ি দিয়ে চারটে রিং বানানো হত শক্ত করে যাতে খেলার সময় ধাক্কা খেয়ে দড়িতে লাগলে দড়িটা স্প্রিঙের কাজ করে। প্রাকটিশের সময় বক্সিং গ্লাভস্ পরে খুব বেমানান লাগত। খেলব কী, গ্লাভস্ পরে হাত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতাম। প্রাকটিসের সময় বুঝলাম আমার মতো নিরীহ মানুষদের পাঞ্চ মারার থেকে মার খাওয়া থেকে বাঁচাই শ্রেয়। না খেলে উপায়ও ছিল না কেন-না খেলাটা ওখানে কম্পালসারি ছিল।

বক্সিং খেলার জন্য আমাদের সবাইকে ওজন অনুযায়ী ভাগ করা হত। সবচেয়ে কম ওজন যাদের তারা ‘হাইড্রোজেন’ গ্রুপে আর সবচেয়ে ওপরে ছিল ‘লাইট ওয়েট’, ‘ফেদার ওয়েট’,

‘হেভি ওয়েট’। কীসব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ছিল। মসকুইটো, বাটারফ্লাই, এখন সেসব সঠিক মনেও নেই। সবাই চাইত কম ওজনের গ্রুপে খেলতে যাতে মারটা কম খাওয়া যায়! কিন্তু আমরা ছিলাম নিরুপায় নিজের ওজন অনুযায়ীই তো গ্রুপ বানানো হত। তখন রোগা ছেলেদের দেখলে হিংসা হত আর স্থূল বা মোটাদের দেখে দুঃখ হলেও মনে মনে সুপ্ত আনন্দ অনুভব করতাম। একটা নির্দিষ্ট দিনে আমাদের ‘বডি ওয়েট’ মাপা হত। সেদিন অনেকে না খেয়ে উপোস করে থাকত। অনেকে ওজন নেওয়ার আগে খুব দৌড়াদৌড়ি করত ওজন কমবে বলে। এখন বুঝি এইসব কসরত ছিল ছেলেবেলার অপরিপক্কতার পরিচয়। অনেকে বাহানা করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে খেলা থেকে রেহাই পেত। অনেকে হাতে ব্যথা বলে ডাক্তারের থেকে কাগজ নিয়ে আসত খেলার থেকে বাঁচার জন্য।

তাই বলে কি সবাই এরকম করত? নিশ্চয়ই না। অনেকে এই খেলাটা মনেপ্রাণে ভালোবাসত। তারা নিজেকে বক্সিং খেলোয়াড় বলে জাহির করত এমনকী অহংকার করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিত যে তাকে কেউ হারাতে পারবে না, ‘I am the greatest’ একবার এক স্কুল ক্যাপ্টেন সবার সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বসল যে তাকে কেউ হারাতে পারবে না। আর সেই সুযোগে তার সঙ্গে বিদ্বেষভাব থাকার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

করল। তারপর বক্সিং রিঙে এক তুমুল যুদ্ধ। শেষমেষ আমাদের রেফারি সিং স্যার এসে খেলা স্থগিত রাখল।

অনেক বন্ধুরা আবার এই বক্সিঙের সঙ্গে পরিচিত ছিল, স্কুলে ঢোকার আগে ক্লাবে কমবেশি পরিমানে বক্সিং খেলেছে। সেইরকম একজন বন্ধু বলত যে বক্সিং খেলায় যদি নাকের হাড়টা ভেঙে যায় তখন ভবিষ্যতে সেই ভাঙা নাকে ঘুষি খেলে ব্যথা করে না। কিন্তু সেই নাকটা ভাঙাটাও তো সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কথা!

প্রথমদিকে খেলাটা দেখতে ভালোই লেগেছিল। দেখতে দেখতে খেলাটা শিখে গেলাম। তিন রাউন্ড খেলা হয়। প্রতিটা রাউন্ডের পর ব্রেক থাকত যখন প্রতিযোগিরা মুখে জল নিত আর পাশে একজন হাত-পা মালিশ করে দিত। ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিত। তারপর যেই ঢং করে ঘণ্টা পড়ত আর রেফারি চেঁচিয়ে উঠতেন “সেকেন্স আউট অফ দ্য রিং” তখন পরের রাউন্ড আরম্ভ হয়ে যেত। আমার খেলার থেকে ওই মালিশটাই বেশি আকর্ষণ করত।

ওইরকম খেলা চলাকালীন আমার যখন নাম এল খেলার জন্য তখন আমি ভয়ে ভয়ে খেলতে রিঙে উঠলাম নিজেকে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন মিস্টার বিন! গ্লাভস পরে ভগবানের নাম নিয়ে উঠলাম ঠিকই কিন্তু বেধরক মার খেলাম। নাক দিয়ে রক্ত, ব্যাথা কিন্তু কোনোমতে তিন রাউন্ড মার খেয়ে টিকে থাকলাম। হেরে

গেলাম ঠিকই কিন্তু একদিকে ভালো হল পরের রাউন্ডে আর খেলতে লাগল না।

সাধারণত এসব কম্পিটিশন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে রাত্রে খেলা হত লাইট জালিয়ে। আমরা রিঙের চারিদিকে বসে খেলোয়াড়দের উৎসাহ জোগাতাম। এ যেন সেই প্রাচীন রোমের কলোসিয়ামের যুদ্ধ। কী বর্বর! কিন্তু তবু খেলতে হবে। রাত্রে খেলার পর যখন ডাইনিং হলে খেতে যেতাম তখন জয়ী ছেলেরা বিজয় উল্লাস করে ঢুকছে আর কারো চোখ ফুলে ঢোল। কারো আবার মার খেয়ে ঠোঁটটা এত ফুলে গেছে যে খেতে পারছে না। কারো আবার নাকের কাছে ঠোঁটের কোণে শুকনো রক্তের দাগ।

একদিন ওইরকম খেলার সময় এক সিনিয়র দাদা পেট ধরে বসে গেল। খেলার সময় প্রচণ্ড জোরে এক পাঞ্চ খেয়ে পেট ধরে বসে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। সেদিন তাকে উঠিয়ে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেই ঘটনাটা আমার মনে খুব দাগ কাটে। ভবিষ্যতে এই বক্সিং খেলাটা আমি কখনোই মেনে নিতে পারিনি।

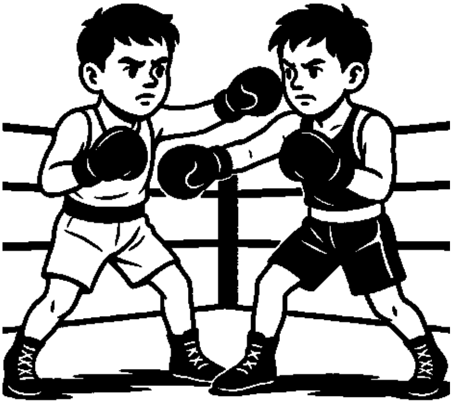

তখন অব্দি ক্যাসিয়াস ক্লে মহম্মদ আলিতে রূপান্তরিত হয়নি। আমরা জানতাম ক্যাসিয়াস ক্লে পৃথিবী বিখ্যাত বক্সিং প্লেয়ার। বক্সিঙের বাদশা। পরবর্তীকালে সেই মহম্মদ আলির পারকিনসন্স অসুখে আক্রান্ত হলেন আর শেষের দিকে পারকিনসন্স অসুখের পরিণতি হল 'ডিমেন্সিয়া' বা স্মৃতিভ্রম। এটাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে 'পাঞ্চ ড্রাঙ্ক সিনড্রোম'। সাধারণত বক্সিং প্লেয়ারদের ক্রমাগত মাথায় বা মস্তিষ্কে আঘাত লাগার জন্য এই পরিণতি হয়।

তারপর? আমি এই খেলার দর্শক হয়েই থাকলাম কিন্তু খেলা যথারীতি চলতে থাকল। অনেকে ধরাশায়ী হল আর অনেকে বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে নেমে এল। মাঝে মাঝে ভাবি তারা সব বহাল তবিয়তে আছে তো! না পারকিনসন্সে ভুগছে। ঈশ্বর করুক আমার ধারনাটা ভুল হোক আর সবাই সুস্থ ও সুখী থাকুক।

আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট ক্লাস

আমাদের সৈনিক স্কুলে ১৯৭২ জুলাইয়ে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই পরিচয় হল দুটো ক্লাসের সঙ্গে যেটা আমার কাছে ছিল নতুন জিনিস। সেই দুটো হল 'আর্ট' আর 'উড ক্রাফ্ট ক্লাস'। আজকের দিনে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রত্যেকটা ছেলে-মেয়েরাই আর্ট শেখে আর্ট স্কুলে গিয়ে কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় এসব ছিল অলীক কল্পনা ও বিলাসিতা।

স্কুল বিল্ডিঙের শেষপ্রান্তে পাশাপাশি দুটো হলঘর ছিল যেটাতে আমাদের আর্ট ও উড ক্রাফ্টের ক্লাস হত। এই দুটো রুমই ছিল স্কুল বিল্ডিঙের একপ্রান্তে।

আমাদের স্কুলের আর্ট টিচার ছিলেন মিস্টার জি. পি. গোস্বামী (গুরুপদ গোস্বামী?)। দেখতে শ্যামলা বর্ণের, হাইট একটু কমই, কুচকুচে কালো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সাদা হাফ শার্টের সঙ্গে সাদা ফুলপ্যান্ট (যেটা আমাদের স্কুলের টিচারদের ইউনিফর্ম), কালো জুতো আর সবসময় হাতে থাকত একটা ছোটো নোটবুক। শার্টের পকেটে একটা মোটা ঢাকনা থাকা কালো ফাউন্টেন কলম। মনে হয় তখনকার দিনে ওটা ছিল দামি 'প্রেসিডেন্ট পেন'।

আর্ট ক্লাসের রুমে বসার জন্য সারি সারি টেবিল ও চেয়ার অর্ধ গোলাকৃতি আকারে রাখা থাকত। এই রুমটা আসলে একটা আর্ট গ্যালারি বলা চলে। রুমটার চারদিকের দেওয়ালে ছাত্রদের বানানো বিভিন্ন ধরনের পেন্টিং ঝোলানো থাকত। পেন্টিংগুলো বিভিন্ন রকমের ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং, পেনসিল স্কেচ ইত্যাদি দিয়ে বানানো। সাধারণত ছাত্রদের বানানো ভালো পেন্টিংগুলোই যত্ন করে রাখা হত আর আমরা ওই পেন্টিংগুলো চেয়ে চেয়ে দেখতাম। সাধারণত একই সময়ে ক্লাসের অর্ধেক ছেলেদের আর্ট ক্লাস হত আর বাকি অর্ধেক ছেলেদের ক্রাফ্ট ক্লাস হত।

আমি আবার না ছিলাম আর্টে ভালো আর না ক্রাফ্টে। আর্ট করা একটা সূক্ষ্ম জিনিস সেটা প্রথমদিকে আমার দ্বারা কিছুই হত না। একদিন ক্লাসে আর্ট স্যার রুমের মাঝখানে একটা বিশাল ভাঙা মাটির হাঁড়ি টেবিলের ওপরে রেখে আমাদেরকে বিভিন্ন কোণ থেকে পেনসিল দিয়ে আঁকতে বললেন। তারমানে আমরা যে যেখানে বসে ছিলাম সেই কোণ থেকেই হাঁড়িটাকে আঁকতে হবে। সেদিনকার ওই কাজটা আমার কাছে এত কঠিন লেগেছিল যে বুঝে গেলাম আমার দ্বারা আর্ট হবে না। আমি কায়দা করে আমার রুমমেট রাউতকে দিয়ে আঁকিয়ে নিলাম। রাউত তো জাত আর্টিস্ট সুতরাং কয়েক সেকেন্ডে আমারটা এঁকে দিয়ে আমাকে সেই যাত্রা থেকে বাঁচিয়ে দিল।

আর একদিন আর্ট ক্লাসে মনে আছে আমাদেরকে আর্ট টিচার গোস্বামী স্যার পেনসিল দিয়ে মানুষ আঁকতে দিলেন। আবার আমি নার্ভাস হয়ে গেলাম। পরে আর্ট স্যার শেখালেন যে একজন মানুষ আঁকতে হলে শরীরের অংশগুলোর হিসাবের পরিমাণ কী অনুসারে হবে। নিজের সাড়ে তিন হাত সেই মানুষের উচ্চতা হওয়া উচিত। সেই আর্ট পেনসিল দিয়ে সেই হিসাবটা করতে হবে। আবার দূরের কোনো কাজ নিজে করতে হলে কীভাবে পেনসিলটা চোখের সামনে ধরে সমানুপাতে আঁকতে হবে। ভিউ ফাইন্ডার টেকনিক, বড়ো জিনিস আঁকার আগে সেটাকেই ছোটো করে 'লে-আউট' বানানো।

আস্তে আস্তে আর্টের অনেক কিছুই গ্রামার শিখলাম স্যারের থেকে কিন্তু গাধা পিটিয়ে তো আর ঘোড়া বানানো যাবে না সুতরাং আমার আর আর্টিস্ট হওয়া হল না। আর্ট ক্লাস হলেই আমার ভয় লাগত যারজন্য ক্লাসটা আমি এনজয় করতাম না। ওইরকম করেই ক্লাস এইট-নাইন অব্দি কাটিয়ে আর্ট ক্লাসকে বাই বাই করে দিলাম।

কিন্তু অবচেতন মনে আর্ট স্যারের অনেক কথাই মনে থেকে গিয়েছিল যা পরবর্তীকালে ডাক্তারি পড়ার সময় আঁকাআঁকি করতে খুব সুবিধা হয়েছিল।

ডাক্তারি পড়ার সময় অ্যানাটমি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সার্জারি সবগুলোতেই ড্রয়িং করতে হত

প্রাকটিক্যাল খাতাতে আর তখন আমার আর্ট টিচার গোস্বামী স্যারকে খুব মনে পড়ত।

আমাদের ক্লাসে অনেকেই ভালো আর্ট করত। তারমধ্যে তিনজনের আর্টের কাজ আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে। তারা হল শঙ্কর রাউত, সুকান্ত ও রাজেশ যাদব। রাজেশ খুব ভালো পোর্ট্রেট বানাত পেনসিল দিয়ে। সে একবার মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোর্ট্রেট বানিয়েছিল তারপর থেকে সে আর্ট টিচারের নেক নজরে চলে আসে। এত বছর পরে দৈনন্দিন জীবনের পরিশ্রম করে তার হয়তো আর আর্টের কথা মনেই নেই।

দ্বিতীয়জন হল আমাদের শঙ্কর রাউত, সে যেহেতু সবসময় আমার হাউসে একই রুমে থাকত তাই তার আর্টের কাজ দেখার সুযোগ আমি বেশি পেয়েছি। একেবারে জাত আর্টিস্ট। একদিকে অন্য ক্লাস চলছে আর রাউত তার খাতাতে লেখার কলম দিয়ে বিভিন্ন স্কেচ করে যাচ্ছে। আমি তার পাশে বসে প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে সেই আঁকিবুঁকি উপভোগ করছি। আর অন্যদিকে ক্লাসের টিচাররা ভাবত রাউত খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসের নোট নিচ্ছে। আমি রাউতের হায়দ্রাবাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তার বাড়ির ড্রইংরুমের দেওয়ালে বিভিন্ন বিষয়ের শৈল্পিক অয়েল পেন্টিং সাজানো দেখেছি। সেগুলো ছিল নমুনা

মাত্র আর কত কাজ সে বিভিন্ন লোকজনদের দিয়ে দিয়েছে, তার হিসেব সে নিজেও জানে না।

তৃতীয়জন হল আমাদের পাগলা দাশু আর্টিস্ট সুকান্ত।

তার আঁকিবুঁকি আমি বিশেষ দেখিনি কিন্তু ক্লাস নাইনের পর তার নিজের আঁকা পোস্টকার্ড আকারে কিছু শিল্প নিদর্শন আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেগুলো ছিল সব ‘ওয়াটার কালার’ দিয়ে বানানো। আমি জানি না তারমধ্যে কী করে দুটো পোস্টকার্ড আর্ট আমার কাছে আজও আছে। একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোট্রেট আর একটা ঝুলন্ত বাঁদর গাছ থেকে ঝোলা অবস্থায় ‘ওয়াটার কালারে’ আঁকা। ক্ষমা করবেন পাঠকেরা এই দুটো বিপরীতধর্মী আর্ট আমার অজান্তে আমার পছন্দ হয়েছিল, এরমধ্যে কোনো অন্য গূঢ় অর্থ নেই! সুকান্তের কাজ খালি আঁকাতে আবদ্ধ ছিল না। তখন লক্ষ করতাম তার প্রত্যেকটা অদ্ভুত কাজের মধ্যেই একটা শৈল্পিক ভাবনা থাকত। যেমন, সাপের চামড়া দিয়ে বেল্ট বানিয়ে কোমরে পরা, দীঘা থেকে আনা বড়ো কচ্ছপের মাথা দিয়ে সিগারেটের অ্যাশট্রে বানানো, কাগজ দিয়ে নেক টাই বানানো। আমি খেয়াল করেছি এইসব প্রত্যেকটা কাজে একটা সৃজনশীলতা বা উদ্ভাবনী ধারনা (creativity) ছিল যেটা অন্যকেউ ভাবতেও পারত না। এইখানেই সে অনন্য। পরবর্তীকালে সুকান্ত নিজস্ব স্টাইলে কোলাজ বানিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করে। তার ঢাউস ঢাউস সব

কোলাজ বিভিন্ন জায়গায় আর্ট এগজিবিশন করেছে। তার পুণের থেকে অল্প দূরেই টেলাগাঁও বাড়িতে যাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে তার নিজের বানানো অনেক কাজ দেখার সুযোগ হয়েছিল। সে এখনো মনেপ্রাণে শিল্পের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। তারজন্য সত্যিই আমরা সবাই গর্বিত।

তখনকার নিয়মানুযায়ী ক্লাস নাইন-টেনে বোধহয় আর্ট না হয় ক্রাফ্ট যেকোনো একটা বেছে নিতে হত ঠিক যেমন বাংলা বা হিন্দির মধ্যে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে হত। আমি উড ক্রাফ্ট বেছে নিয়েছিলাম। তারমানে এই নয় যে আমি ক্রাফ্ট করতে ভালোবাসতাম বা উড ক্রাফ্টে বিরাট পারদর্শী ছিলাম। এটা ছিল আমার 'অগতির গতি'! দুটোতেই তো আমার অবস্থা কাহিল সুতরাং একটা যখন নিতে হবে উড ক্রাফ্ট নেওয়াই ভালো। 'কমসে কম' শরীরের শক্তি দিয়ে পুষিয়ে দিতে পারব।

এবার উড ক্রাফ্ট ক্লাসের কথায় আসি। এই ক্রাফ্ট ক্লাসে কাঠের কাজ শেখানো হত। এখানেও একজন পার্মানেন্ট ক্রাফ্ট টিচার ছিলেন মিস্টার সূত্রধর। উনি যদিও একটু স্থূলকায় ছিলেন, অল্প কোঁকড়ানো চুল ব্যাকব্রাশ করা আর চুলের দু-দিকে অল্প খালি জায়গা। সাধারণত উনি হাফ শার্ট না গুঁজে ফুলপ্যান্টের ওপর পরতেন। বাঁ হাতে একটা কালো বেল্ট থাকা ঘড়ি পরতেন। শীতকালে হাফ সোয়েটার কিংবা একটা খয়েরি রঙের ব্লেজার। উনি খুব অমায়িক লোক ছিলেন। বেশি বকাঝকা করতেন না,

রাগারাগিও করতেন না। সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন আর কাঠের কাজ না করতে পারলে নিজেই সাহায্য করতেন।

ওই আর্ট ক্লাসে আমাদের কাজ ছিল কাঠের সঠিক মাপজোক করা। বিভিন্ন যন্ত্রের নাম জানা ও তাদের বিভিন্ন অংশের নাম মনে রাখা।

তিনটে জিনিস খুব ব্যবহার করতাম যেমন কাঠ প্লেন করার জন্য 'প্লেন' বা রাঁদা মারা, 'চিজল' বা বাটালি দিয়ে কাঠ ছোলা আর 'ম্যালেট' বা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে গোঁতা মারা। 'শ' বা করাত যেটা কাঠকে সাইজ অনুযায়ী চিরতে দরকার হত। আর একটা যন্ত্র বেশ অভিনব লাগত সেটা হল 'আগর' যেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠেলে দিলেই কাঠে ফুটো হয়ে যেত। এইসব ব্যবহার করতে শরীরে রীতিমতো ঘাম বার হয়ে যেত তথাপিও আমার দ্বারা গঠনমূলক কাজ কিছু হত না! তার ওপরেও ক্রাফ্ট খাতা ছিল যেটাতে যন্ত্রপাতির ছবি এঁকে লেবেল করতে হত। তারমানে আবার আঁকাআঁকি!

আমাদের ক্লাসে অনেকেই উড ক্রাফ্টে ভালো ছিল যেমন প্রদীপ বরুয়া, দেবাশীষ দত্ত। সেইজন্যই বোধহয় দেবাশীষকে 'কাষ্ঠ' নামেই ডাকা হত।

সেই 'উড ক্রাফ্টের' রুমটা প্রকাণ্ড বড় ছিল। যতদূর মনে পড়ে আর একটা ছোটো রুম তার ভিতরে ছিল। গোটা হল

ঘরটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অনেক কাঠের পাটাতন, দুই তিনটে লম্বা কাঠের টেবিল যার ওপরে আমরা কাঠের কাজ করতাম। পুরোনো ছাত্রদের বানানো অনেক কাঠের নিদর্শন পিছন দিকে রাখা থাকত। কিন্তু হলঘরটা দেখতে একটু অগোছালোই লাগত। ঠিক ক্রাফ্ট রুমের বাইরে লম্বা করিডোরে অনেক সময় আমরা কাঠের কাজ করতাম। আর করিডোরটা ঘেরা থাকত একটা 'হাফ ওয়াল' দিয়ে যেটাতে আমরা উঠে বসতেও পারতাম আবার টপকে বাইরেও যেতে পারতাম। ঠিক ওই জায়গাতেই আমাদের 'মিল্ক ব্রেক' (টিফিন) হত।

এখন ফার্নিচার বানাতে গেলে দেখি আগের আমাদের জামানার কোনো যন্ত্রপাতি এখন আর ব্যবহার হয় না। কাঠ

কাটার জন্য, মসৃণ করার জন্য পুরোনো যন্ত্রের ব্যবহার নেই তার পরিবর্তে সব ইলেকট্রিক ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়। মিস্ত্রিদের পরিশ্রম কমে গেছে পাশাপাশি সময়ও অনেক কম লাগে। এখন প্লাইউড কাঠের জায়গা দখল করে নিয়েছে। কিন্তু স্কুলে গেলে সেই ক্রাফ্ট ও আর্ট রুমগুলো দেখতে ভুলি না।

ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল,
লাগল যে দোল...

আমাদের বাড়ির ব্যালকনি থেকে দেখতে পাচ্ছি পাড়ার লোকেরা রঙ খেলায় মেতে উঠেছে। আজ দোল পূর্ণিমা ‘হোলি’। আজ আমার বন্ধের দিন কিন্তু জানি আমি ওই রঙের জঞ্জালে না গিয়ে আজ গোটা দিন শুয়ে-বসে বই নিয়ে কাটাব। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ব্যালকনিতে বসেই চলে গেলাম সেই সত্তর দশকের সৈনিক স্কুলে পুরুলিয়ার চত্বরে।

এই হোলির দিনটা স্কুলে ছুটিই থাকত। আর সকালে ব্রেকফাস্টের পর আমাদের হাতে নির্দিষ্ট পরিমানের আবির (ফাগুয়া) দিয়ে দেওয়া হত। সেখানে কোনো পিচকিরি বা রঙের ব্যবস্থা থাকত না। স্কুল ক্যাপ্টেন একটা হুইসেল বাজিয়ে সবাইকে হোলি খেলার নির্দেশ দিত। সবটাই ছিল নিয়মে বাঁধা। এখন সেইসব কারবার যেন মনে হয় খুব যান্ত্রিক ছিল।

আমরা কষ্ট করে এমন ড্রেস বার করতাম যেগুলো যথেষ্ট পুরোনো হয়তো-বা একটু ছেঁড়া। পরবর্তীকালে হোলি খেলার আবিরের রং না উঠলে যাতে সেগুলো ফেলে দেওয়া যায়।

এই হোলি বা দোল উৎসবকে আমি সাধারণত দুইভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত রোমান্টিক হিন্দি সিনেমা

‘সিলসিলা’-র আগে ও পরে। মানে Pre Silsila and Post Silsila হোলি। সিলসিলা সিনেমার আগে অব্দি হোলি মানেই ছেঁড়া, নোংরা জামাপ্যান্ট পরে খেলতে হবে। পুরোনো গানগুলো চলবে যেমন, ‘সারা রারা...’ ‘আজ না ছোড়েঙ্গে...’ ‘হোলি কে দিন যাব...’ কিংবা নিদেনপক্ষে ‘খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল...’।

কিন্তু সিলসিলা সিনেমা আসার কয়েক বছরের মধ্যে হোলির কনসেপ্টই বদলে গেল। হোলির সময় পরিষ্কার সাদা ধবধবে পাজামা-কুর্তা কিংবা হলুদ বা বাসন্তী রঙের ড্রেস পড়তে হবে। নোংরা জল, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি সব বন্ধ হয়ে গেল। ওইদিনে লঘু সুরাপান আন-অফিসিয়ালি সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গেল।

যাইহোক সেই কৈশোরের সন্ধিক্ষণে হাতে আবিরের ছোট্ট একটা প্যাকেট নিয়ে হোস্টেল থেকে বার হয়ে একে অপরকে ফাগুয়া ছোঁড়াছুঁড়ি করতে করতে খেলার মাঠ পেরিয়ে পৌঁছে যেতাম হোলি খেলার নির্দিষ্ট জায়গাতে।

সেটা ছিল মেইন খেলার মাঠ পার হয়েই একটু নীচু এলাকা। ওখানে চারিদিকে অনুর্বর মাটিতে লম্বা লম্বা গাছ আর কিছু উঁচু ঢিপি। সেখানে সেই ফাল্গুন মাসের সকাল দশটাতেও খুব একটা রোদের উপদ্রব ছিল না। সুতরাং হোলি খেলার জন্য উপযুক্ত স্থান। ওখানে সবাই কিছুক্ষণ জমায়েত হবার পরেই আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল, হেডমাস্টার মশায় ও রেজিস্টার আসতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ক্যাপ্টেনের হুইসেলের আওয়াজ ও জোরালো

গলায় নির্দেশ, ‘সিটডাউন, বৈঠ যাও’। আমরাও চারিদিকে গোল হয়ে বসে যেতাম আর মাঝখানে চেয়ারে মধ্যমণির আসন গ্রহণ করতেন প্রিন্সিপাল ও বাকি শিক্ষকরা। ততক্ষণে রঙের কোলাজে একে ওপরের মুখ কিম্ভূতকিমাকার। কেউ কাউকে চিনছি না আন্দাজে ঢিল মারতে লাগত।

তারপর ওখানেই একটা ছোট্ট জলসা অনুষ্ঠান হত। কিছু ছাত্র ও কিছু টিচাররা তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করত গান, কবিতা আবৃত্তি ও হিন্দি শায়েরি। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে গায়ক সেই একই, ‘থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড়’।

আমাদের এক অঙ্ক টিচার ছিলেন উনি সেই রঙ মাখা মুখ নিয়ে খুব আবেগ দিয়ে শায়েরি কিংবা হিন্দি কবিতা পাঠ করতেন। সেই বয়সে ওইসবের মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতাম না তবুও হাততালি দিয়ে শায়রকে আরো অনুপ্রাণিত করতাম অনিচ্ছাকৃত আর একটা দুর্বদ্ধ শায়রি শোনার জন্য।

কিন্তু অন্য আর একজন টিচারের গান পল্লীগীতি, ‘কমলা হে নৃত্য করে...’ বেশ মজা করে শুনতাম।

সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন চলে আসত ঠাণ্ডা পানীয় ও একটা প্যাকেটে কিছু স্ন্যাকস। এই পাওনাটাই ছিল আমাদের মেইন আকর্ষণ। ওই প্যাকেটের ভিতরে থাকত ঠাণ্ডা সিঙারা

(এটাকে তখন আমরা সামোসা বলতাম)। বন্দি হোস্টেল জীবনে ওই এক প্যাকেট স্ন্যাকস আমাদেরকে দিত অমৃতের স্বাদ।

তারপর অনুষ্ঠান শেষ। এবার যাওয়ার পালা আর হোলির রঙ ওঠানোর পালা।

তাড়াহুড়ো করে হোস্টেলে আসার পরেই সবাই বাথরুমে জলের জন্য হুটোপুটি। জল কতক্ষণ থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি ছিল না। কোনোমতে সাবান দিয়ে স্নান করে রুমে আসতাম যুদ্ধ জয় করে আসা সৈনিকের মতো। এসে দেখতাম সেইসব বন্ধুদের যারা চুপচাপ লুকিয়ে ছিল হোস্টেলে, হোলি না খেলার জন্য। তারা তখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একেবারে সাদা ক্যানভাস!

এবার ডাইনিং হলে লাঞ্চের পালা। সেদিন খাওয়াটা একটু স্পেশাল থাকত। লাঞ্চের পরেই সব ঢিলেঢালা ভাব। সবাই ক্লান্ত

হয়ে বিশ্রাম নিত আর তখন প্রিন্সিপাল, হেডমাস্টারের নিজস্ব পার্টি আরম্ভ হত। এই সময়টা ঠিক সেই অবন ঠাকুরের *ক্ষীরের পুতুল* গল্পের ষষ্ঠী ঠাকুরের চাতালের কথা মনে করিয়ে দেয়। যেখানে সবাই হঠাৎ করে ঘুমে ঢলে পড়েছিল।

স্কুল থেকে পালিয়ে টাউন যাওয়ার ওটাই ছিল আদর্শ সময়। অনেকবার সেই সুযোগ আমি সদ্ব্যবহার করেছি। সেই গল্প না হয় পরেই বলব।

স্কুলের স্যারেরা

আমাদের স্কুল জীবনে আট বছর ধরে (১৯৭২–১৯৮০) অনেক শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের থাকতে হয়েছে। সৈনিক স্কুল যেহেতু রেসিডেনসিয়াল স্কুল ছিল সেইজন্য বেশিরভাগ শিক্ষক ক্লাসে ক্লাস নেওয়ার বাইরেও আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, পিকনিকে যাওয়া ও বিপদে আপদে সঙ্গে থেকেছেন। তখন যদিও ওঁদের নিয়ম শৃঙ্খলা অনেক সময় আমাদের ভালো লাগত না কিন্তু পরবর্তীকালে দেখলাম স্যারেরা আমাদের অবচেতন মনে কত গভীর দাগ ফেলে গিয়েছেন। এখন আমি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা করি ও ডাক্তারি পড়াই কিন্তু উপলব্ধি করি আমাদের স্কুলের অনেক স্যার এখনো আমার ‘রোল মডেল’।

সরকার স্যারকে প্রথম দেখেছিলাম ক্লাস সিক্সে প্রথম যেদিন ভূগোলের ক্লাস নিতে এলেন। ক্লাসে ঢুকেই একটা চক নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে একহাতে একটা নিখুঁত বৃত্ত এঁকে দিলেন। তারপর সেই বৃত্তটাকে পুরো আকার দিলেন গোলার্ধের আকারে। তারপর শুরু হত ওঁর ক্লাস, পৃথিবীর ভৌগলিক বিষয়ে। চাঁচাছোলা সুন্দর ইংরেজিতে একটা নিজস্ব স্টাইলে কথা বলতেন আর ওঁর মুখের গাম্ভীর্যতা একটা আলাদা মাত্রা এনে দিত।

সরকার স্যার স্কুলের নিয়মানুযায়ী সাদা জামা-প্যান্ট পরেই ক্লাস নিতে আসতেন। কানের পাশে জুলফি, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা তার গ্লাসটা থেকে আবার হালকা নীলচে আভা ফুটে আসত। স্যার ক্লাস নিতে এলে আমরা সবাই একটু তটস্থ হয়ে উঠতাম। ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ হাতের চকটা ছুঁড়ে দিতেন কোনো ছেলের দিকে যে একটু অন্যমনস্ক কিংবা ঘুমোচ্ছে। আর এই চক ছোঁড়াটা ঠিক টার্গেট ভেদ করত কোনোদিন ভুল লক্ষ্যে হিট করত না। পরে জেনেছিলাম যে উনি ভীষণ ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন আর ক্রিকেটে তখনকার দিনে 'রঞ্জী ট্রফি' খেলেছিলেন। রবিবারে টিচার বনাম স্টুডেন্টদের খেলার সময় সরকার স্যারের খেলা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করত। এমনকী স্যার খুব ভালো 'মাউথ-অর্গান'ও বাজাতেন।

কিন্তু আমরা থাকা অবস্থায় উনি আমাদের স্কুলে বেশিদিন থাকেননি। আমরা ক্লাস এইটে ওঠার পর উনি আমাদের সৈনিক স্কুল ছেড়ে কলকাতার 'লা-মার্টিনিয়ার' স্কুলে চলে গেলেন। সেদিন আমরা একজন বড়ো মাপের অলরাউন্ডার শিক্ষককে হারালাম। সবাই সেইজন্য খুব দুঃখ করত। পরবর্তীকালে স্যারের সঙ্গে স্কুলের রিইউনিয়নে দেখা হয়েছে কিন্তু ততদিনে আমরা বয়স্ক লোক হয়ে গেছি, আমাদের দৃষ্টির পরিবর্তন হয়েছে।

স্কুলে ঢোকার প্রথমদিন থেকেই যে স্যারকে দিনেরাতে দেখতে পেতাম তিনি হলেন মিস্টার টি পি দাস যার ফুল নাম—

তারাপদ দাস। উনি ছিলেন একটু লালচে ফর্সা যারফলে রেগে গেলে গোটা মুখমণ্ডল লাল হয় যেত। মাথায় বিরাট টাক আর কানের ওপরে চারিদিকে কালো চুল ছোটো করে ছাঁটা। নাকের নীচে স্পষ্ট গোঁফ একটু খোঁচা খোঁচা। সকাল হলেই স্যারকে দেখতাম আমাদের সঙ্গে লম্বা ঢোলা হাফ প্যান্ট পরে পি.টি. করছেন। আবার বিকেলে দেখতাম ঠিক খেলার মাঠে হাজির হয়ে গেছেন। উনি ঠিক খেলতেন না কিন্তু আমাদেরকে নজরদারি করতেন।

ক্লাস সিক্সে মিস্টার টি পি দাস স্যার আমাদের হিন্দি ক্লাস নিতেন। স্কুলে ঢুকে এই হিন্দি আমার জন্য ছিল এক নতুন ভাষা। খুব কষ্ট করে শিখতে হয়েছিল আর সেই নতুন ভাষা হিন্দি শিখে লিখতে মিস্টার টি পি দাস স্যার খুব সাহায্য করেছিলেন। আসলে স্যার ছিলেন সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক কিন্তু আমাদেরকে তিনি অন্য অনেক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্লাস নিয়েছিলেন। সাময়িকভাবে ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি, অঙ্ক ক্লাসও নিয়েছিলেন। কোনো নির্দিষ্ট টিচার ছুটি নিয়েছেন ব্যাস মিস্টার টি পি দাস স্যার সেই পিরিয়ডটা নিয়ে নিতেন।

দাস স্যার ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডে একটা জিনিস লিখতেন, DLFGH আর তার মানে জিগ্যেস করতেন। প্রথমদিন আমরা জানতাম না তখন তিনি তার মানেটা বলতেন—Days Left For Going Home. তারপর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার জন্য

যতদিন বাকি থাকত সেটা পাশে লিখে দিতেন। আর প্রত্যেকদিন এসে তার থেকে একদিন কমিয়ে দিতেন। ক্লাস ফাইভ সিক্সে আমরা তখন ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতাম তাই সেই DLFGH খেলাটা বেশ ভালোই লাগত।

স্যারের মুখ থেকে একটা হিন্দি ডায়লগ খুব শুনতে পেতাম। সেটা হল, 'চুল্লু ভর পানি মে ডুব মরো।' প্রথমদিকে এর মানে বুঝতাম না কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তার মানে বোধগম্য হল তখন খুব হেসেছিলাম।

পরে জেনেছিলাম দাস স্যার আমাদের স্কুলের সহকারী হেডমাস্টার। আমাদের হোস্টেলের সামনে নাতিদূরত্বে একটা হলদে রঙের একতলা ঘর ছিল স্যার সেখানেই একা থাকতেন। স্যার আমাদের স্কুলের সঙ্গে সকাল থেকে রাত অব্দি নিঃস্বার্থভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতেন।

আমরা ১৯৮০-তে সৈনিক স্কুল ছাড়ার পরে শুনেছিলাম দাস স্যার রাষ্ট্রিয় শিক্ষক হিসেবে মর্যাদা পেয়ে রাষ্ট্রপতির থেকে 'টিচার্স ডে' তে পুরস্কার পেয়েছিলেন। খবরটা শুনে সেদিন খুব গর্ব হয়েছিল ভেবে যে আমরা ওঁরই ছাত্র।

আর একজন শিক্ষক ছিলেন মিস্টার ডি কে ব্যানার্জী। স্যার দেখতে শুনতে ছোটোখাটো, গায়ের রঙটা ফর্সা। মাথায় কালো কুচকুচে চুল থাকলেও মাঝখানের চকচকে টাকটা বেশ

উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিত। জামাকাপড় খুব পরিপাটিভাবে পরতেন। এমনকী কালো জুতো জোড়া সবসময় চকচক করত। খুব ফুর্তিবাজ ও মিশুকে ছিলেন। সব ছাত্রদেরকে নামে ধামে চিনতেন। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি তিনটে ভাষাই খুব ভালো বলতে পারতেন ও পারদর্শী ছিলেন।

একটা সময় কয়েকবছর উনি আমাদের টেগোর হাউসের হাউসমাস্টার ছিলেন। হাউসমাস্টার থাকাকালীন সেইসময় 'ইলোকিউশন' প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের বক্তৃতা বানাতে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। আর সবচেয়ে ভালো লাগতো উনি বক্তৃতাগুলো খুব মজার মজার বানাতেন। এখন বুঝতে পারি যে ওঁর চিন্তাধারার মধ্যে একটা 'আউট অব দ্য বক্স থিঙ্কিং' ব্যপার ছিল।

খেলার মাঠে এমনকী এন.সি.সি. ফিল্ডেও ওঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করতাম। ব্যানার্জী স্যার আমাদের বিজ্ঞান ও ফিজিক্স পড়াতেন। আমরাও মন দিয়ে শিখতাম আবার সন্ধেবেলার প্রেপে বদমাইশি করলে শাস্তিও পেতাম। উনি আবার এন.সি.সি.-তে সাদা হাফপ্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে আসতেন। পরে জেনেছিলাম ওটা নাকি 'নেভি'-র ইউনিফর্ম। স্যারের থেকেই প্রথম শিখেছিলাম যে স্যালুট বিভিন্ন ধরনের হয়। আর্মির, এয়ারফোর্স ও নেভি তিনজনের স্যালুট আলাদা।

যতদূর মনে পড়ে আমরা যখন ক্লাস টেনে তখন উনি আমাদের সৈনিক স্কুল ছেড়ে কলকাতার 'লা-মার্টিনিয়ার' স্কুলে জয়েন করেন।

আমাদের আর একজন স্যার মিস্টার ডি কে সিনহা খুব ওতপ্রোতভাবে স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্যার আকৃতিতে একটু খর্বাকৃতি, মাথার চুল একটু ফ্যাকাশে কিন্তু একদিকে সিঁথি করে কোনোমতে টাকটা ঢেকে রাখতেন আর সবসময় হাতে থাকত একটা রিস্ট-ওয়াচ। সিনহা স্যার সবসময় গম্ভীর থাকতেন। উনি বেশিরভাগ সময় উপদেশ দিতেন আর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দিতেন। ওঁকে হালকা মুডে বা হাসতে খুব কম দেখতাম।

মিস্টার ডি কে সিনহা আমাদের ইতিহাস পড়াতেন আর তিলক হাউসের হাউসমাস্টার ছিলেন। স্যার কিন্তু সবসময় ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকতেন। ওঁর ড্রেস সবসময় খুব পরিপাটি থাকত। স্যার আবার এন.সি.সি. ইনচার্জ হওয়ার জন্য প্যারেড খুব ভালো করতেন আবার এন.সি.সি.-র দিন ঠিক উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে দেখাশোনা করতেন। প্যারেডের সময় ওঁর বিখ্যাত ডায়লগ ছিল, "ডোন্ট স্ট্যান্ড লাইক ওরাং ওটাং!" সেইসময় চোখের সামনে ভেসে আসত চিড়িয়াখানাতে দেখা ওরাং ওটাঙের ছবি আর নিজেকে মেলাতে চেষ্টা করতাম ওরাং ওটাঙের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য।

মিস্টার ডি কে সিনহা স্যারও রাষ্ট্রিয় শিক্ষক হিসেবে মর্যাদা পেয়ে রাষ্ট্রপতির থেকে 'টিচার্স ডে'-তে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

শুনেছিলাম ওঁর বাড়ি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে ছিল যার জন্য তিনি দুর্গাপুজোর সময় স্কুলেই থাকতেন আর গরম ও শীতের ছুটিতে উত্তরবঙ্গের ছাত্রদের এসকর্ট করে নিয়ে যেতেন।

এখনো মনে পড়ে হোলির দিনে স্যারের সেই বিখ্যাত গান, 'কমলা হে নৃত্য করে...'

এইরকম আমাদের স্কুলের অনেক শিক্ষক ছিলেন যাদের কথা আজও মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সবার নাম বলে সময় ও জায়গা নষ্ট না করাই ভালো। তবু যাঁদের কথা খুব মনে পড়ে তাঁদের কথা এখানে না লিখে পারলাম না।

আর একজন ছিলেন মিস্টার এস কে কানুনগো। উনি ছিলেন আমাদের অঙ্কের শিক্ষক। কানুনগো স্যারকে না পেলে হয়তো-বা আমার অঙ্ক শেখাই হত না। উনি ভীষণ উচ্চপর্যায়ের শিক্ষক ছিলেন। আমাদের মতো মধ্যমবর্তী ছাত্রদের জন্য তাঁর অঙ্ক বোঝানোর ক্ষমতা ছিল অসীম। প্রত্যেকটা অঙ্ক, লগ, জিয়োমেট্রি, ট্রিকিয়োনোমেট্রি, ক্যালকুলাস যাইহোক উনি খুব সহজেই জলের মতো বুঝিয়ে দিতেন। ওঁকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার জন্যই আমি ক্লাস টেন ও টুয়েলভে লেটার নম্বর পাই।

এই মিস্টার কানুনগো স্যার মাছ খেতে খুব ভালোবাসতেন। স্কুলের সব ছাত্ররাই সেটা জানত যারফলে একটা সময় স্যারকে এটা নিয়ে প্রচণ্ড রাগানো হত। ওঁর ক্লাসের আগে ব্ল্যাকবোর্ডে মাছের ফটো এঁকে দিলে উনি রাগ করে আর ক্লাস নিতেন না। আর কম বয়েসে ছাত্রদের মধ্যে এটা ছিল একটা মজার খেলা এবং ক্লাস না করার এক সহজ উপায়। কিন্তু সেই পদ্ধতি চালু হলেও বেশিদিন টেকেনি। সবাই নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরে আবার কানুনগো স্যারের থেকে ক্ষমা খুঁজে ভদ্র ছাত্র হয়ে ক্লাস করতে লেগে গিয়েছিল।

কানুনগো স্যার হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুব ভালো গান গাইতেন। একটু সিনিয়র হওয়ার পর আমাদেরকে কয়েকটা গান শিখিয়েছিলেন যেইগুলো আমরা প্রতিদিন অ্যাসেম্বলিতে অভ্যর্থনা সংগীত হিসাবে গাইতাম। সেইসব গানের মধ্যে ছিল, ‘আনন্দলোকে...’ ‘এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে...’ এখনো গানগুলো শুনলে সেইসময়ের কথা মনে পড়ে আর সঙ্গে মনে পড়ে যায় কানুনগো স্যারের কথা।

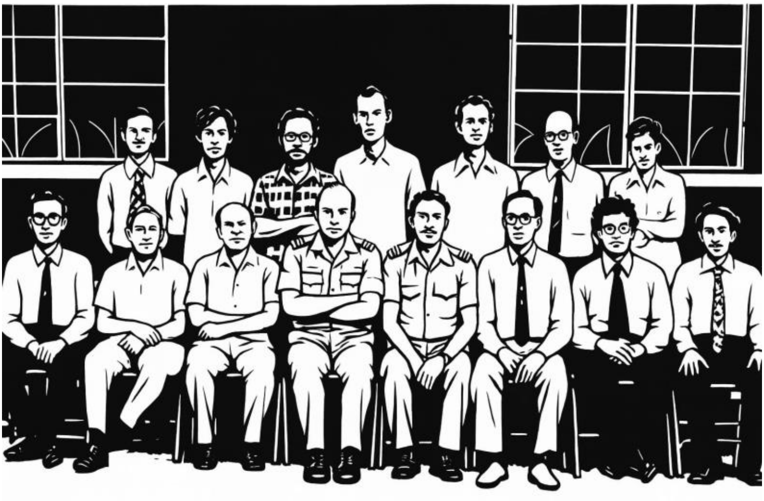

আমাদের স্যারেরা

আমাদের সৈনিক স্কুলের অনেক স্যারদেরকে আমরা পেয়েছি। আর তাঁদের অবদান যে কতখানি সেটা স্কুল জীবনে বুঝিনি কিন্তু স্কুল থেকে বার হয়ে প্রতি পদক্ষেপে বুঝতে পেরেছি।

সবার কথা স্মৃতিতে ভেসে আসে, কিছু আবছা আবার কিছু স্পষ্ট। মনে হয় যেন বেশি পুরোনো হয়নি একেবারে টাটকা। সত্যিই কি 'স্মৃতি সততই সুখের?'

এই সংক্ষিপ্ত জায়গাতে সব স্যারদের কথা তো বলা সম্ভব নয় তাই স্মৃতি হাতড়ে যেটুকু মনে আছে তাই লিখলাম।

উনিশ-শো বাহাত্তর (১৯৭২) সালে ক্লাস ফাইভে ঢুকে প্রথমেই পেলাম মিস্টার বি কে বোস স্যারকে। ফর্সা চেহারা, মুখটা পরিষ্কার করে শেভ করা। চুলগুলো অল্প কোঁকড়ানো ও ব্যাকব্রাশ করা। কপালের ওপরে চুল কম। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সাদা শার্ট প্যান্ট আর ওপরের শার্টটা সবসময় প্যান্টের ওপরে ঝুলে থাকত, শার্টটা ভিতরে গুঁজতেন না। ওঁর শরীর থেকে সবসময় একটা হালকা পারফিউমের গন্ধ ম ম করত। তিনি সাধারণত ইংরেজি ক্লাস নিতেন আর কিছুক্ষণ পরপর 'ফলোড, ফলোড...' বলাটা একটা মুদ্রাদোষ ছিল। প্রথম দিন ক্লাসে তিনি সবাইকে একটা করে 'নিক নেম' দিয়ে দিলেন যেমন,

‘বাত্তিবাবু’, কুমন্ত্র, ছোলা কলা ব্রাহ্মন, ইত্যাদি। ভালো না লাগলেও সবাই খুব হাসাহাসি করল।

মিস্টার বি কে বোস স্যার আমাদের ইংলিশ ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। তিনি আমাদের ক্লাসের সবার নাড়িনক্ষত্র জানতেন। সন্ধেবেলার প্রেপ ক্লাসে নজরদারি করতেন। যতদূর মনে আছে উনি প্যাটেল হাউসের হাউস মাস্টার ছিলেন। রোজ খাওয়া-দাওয়া আমাদের সঙ্গেই ডাইনিং হলে খেতেন। বোস স্যার কোয়ার্টারে একাই থাকতেন। ক্লাস টুয়েলভ অব্দি আমরা বোস স্যারকে স্কুলে পেয়েছিলাম। তারপর আর যোগাযোগ ছিল না। কয়েক বছর আগে খবর পেলাম তিনি মারা গেছেন।

আমরা একই নামের দু-জন স্যারকে পেয়েছিলাম। একজন মিস্টার প্রতুল দত্ত মধ্যবয়স্ক আর একজন মিস্টার প্রতুল লাহিড়ী বেশ কমবয়সী ব্যাচেলর।

মিস্টার প্রতুল দত্ত স্যার বাংলা পড়াতেন। উনি আবার ছিলেন আমার লোকাল গার্জেন যেহেতু একটা সময় ওঁর স্ত্রী বনানী মাসি আমার মায়ের সঙ্গে রামপুরহাট গার্লসে একই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

প্রতুল দত্ত স্যার প্রথমদিকে আমাদের বাংলা পড়ালেও একটা সময় ইংরাজিও পড়িয়েছেন। তিনি কথা কম বলতেন কিন্তু বললে খুব স্পষ্টভাবে চাঁছাছোলা ভাষায় বলতেন। মাঝে মাঝে

‘বাঁদর’ বলে গাল দিতেন। তিনি একটু আনমনা ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন আর চলাফেরা সবসময় ছিল একটু শ্লথ। কালো চুলগুলোয় মধ্যে সাদা চুল দূর থেকেও দেখা যেত। চোখে হাই পাওয়ারের কালো ফ্রেমের চশমা আর হাতে কোনোদিন ঘড়ি পরতেন না। স্যার একবার বলেছিলেন যে, ‘ঘড়ি পরে সময়ের দাসত্ব তিনি করতে চান না।’

বিকেলের গেমসের সময় স্যারকে বিশেষ দেখতাম না আর স্কুলের অ্যাসেম্বলির সময় হন্তদন্ত হয়ে হাজির হতেন। আর কোনদিন আমাদের ডাইনিং হলে খেতেন না।

প্রতুল দত্ত স্যারের ক্লাসটা খুব ভালো লাগত কেন-না তিনি অনেক নতুন কিছু বইয়ের বাইরের কথা বলতেন। সপ্তাহে একটা পিরিয়ড গল্প বলতেন তারমধ্যে অনেক গল্প নিজের বানানো। আমরা সেইসময় হাঁ করে তাকিয়ে সেইসব গল্প গোগ্রাসে গিলতাম।

স্যার খুব ভালো নাটক পরিচালনা করতেন। তারমধ্যে ইংরেজি নাটক ‘সেন্টিনেল’ সবার মন জয় করে নিয়েছিল। সেটা স্কুল ড্রামা হিসেবে প্রতিযোগিতায় গিয়েছিল। সবার অভিনয়, স্টেজ পরিচালনা, ড্রেস অতুলনীয় ছিল।

পরে জানতে পেরেছিলাম যে স্যার সাহিত্য ভালোবাসতেন ও সাহিত্য নিয়ে রীতিমতো চর্চা করতেন। সেই সত্তর দশকে

বাংলা *দেশ* নিয়মিত পড়তেন ও লিখতেন। একটা লেখা আমার এখনো মনে আছে 'Daddy with long legs'-এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, 'বাবা শ্রী লম্বা চরণ'। একবার স্যারের কথা *দেশ* পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন। কোনো একসময় সেই যুগের যুগান্তকারী বেশ কিছু বাংলা লেখক ওঁর সেই কোয়ার্টারে আড্ডা দিতে দেখেছিলাম। তারমধ্যে মধ্যমণি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমার স্পষ্ট মনে আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কি না আমার ঠিক মনে নেই।

তার কয়েক বছরের মধ্যেই স্যার আমাদের সৈনিক স্কুল ছেড়ে কালিম্পং ও পরবর্তীকালে কলকাতার সেন্ট পলস্ স্কুলে শিক্ষকতা করতে লাগলেন আর আমরা আর এক বহুমুখী প্রতিভা থাকা এক শিক্ষককে হারালাম।

প্রতুল দত্ত স্যারের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল সৈনিক স্কুলের সোনালিজয়ন্তীতে। শেষ বয়সে পারকিনসন্স ডিমেনশিয়া হয় ও তিনি মারা যান।

প্রথমবার প্রতুল লাহিড়ী স্যারকে পেয়েছিলাম একটু উঁচু ক্লাসে। তখন কেমিস্ট্রি পড়াতে এলেন। বেশ ছিপছিপে চেহারা, মুখটা একটু লম্বাটে আর পরিপাটি করে দাড়ি কামানোর জন্য গালে একটু নীলচে ভাব ফুটে উঠত। তখন উনি সদ্য ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে শিক্ষক হয়ে জয়েন করেছেন। তখন উনি ব্যাচেলর আর আমরা স্কুলে থাকা অব্দি মানে ১৯৮০

অব্দি ওঁকে ব্যাচেলরই দেখে এসেছি। ওঁর আদিবাড়ি বোধহয় বহরমপুর কাঁদি ছিল। লাহিড়ী স্যার খুব গম্ভীর থাকার চেষ্টা করতেন আর আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম সবসময় ওঁকে একটু রসিকতা করে হাসাতে। উনি সবসময় ইংলিশ ছাড়া অন্য ভাষা না বলার চেষ্টা করতেন। আর আমরা বাংলায় প্রশ্ন জিগ্যেস করে ব্যতিব্যস্ত করে দিতাম ওঁর মুখ থেকে বাংলা শোনার জন্য।

কিন্তু স্যারের পড়ানোটা, নোটগুলো খুব ভালো ছিল। উনি খুব সিরিয়াসলি ক্লাসগুলো নিতেন। ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে পড়াতে আরম্ভ করে দিতেন। আড়ালে আমরা ওঁকে তাই ‘রাজধানী এক্সপ্রেস’ বলতাম।

আমাদেরকে রসায়ন বিদ্যার রস উনিই গুলে খাইয়েছিলেন যারজন্য ওঁর প্রতি আজও আমি কৃতজ্ঞ।

আমরা মাঝে মাঝে আবদার করতাম পড়াশোনা বন্ধ রেখে গল্প বলতে। উনি সেই বাৎসল্যের আবদার মাঝে মধ্যে মেনে নিয়ে গল্প বলতেন। যেমন ফাস্ট বোলার লারউ-এর আত্মজীবনী কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ম্যানহাটনে অ্যাটম বোমা বানানোর ও ফেলার ঘটনা। সেইসব গল্প আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম আর কল্পনার জগতে চলে যেতাম। এতদিন পরে সেই গল্পই ‘ওপেনহ্যামার’ সিনেমা আকারে বের হল।

ক্লাস টুয়েলভ অব্দি লাহিড়ী স্যার আমাদের কেমিস্ট্রি পড়ালেন। টুয়েলভ পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে ভালোই রেজাল্ট করলাম।

উনিশ-শো আশিতে সৈনিক স্কুল থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর লাহিড়ী স্যারের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। যেখানেই থাকুন স্যার ভালো থাকবেন, আমার প্রণাম নেবেন।

আমাদের হিন্দি টিচার ছিলেন মিস্টার শ্যামদেও ঝা মানে মিস্টার এস ডি ঝা স্যারের কথা বলছি। ওঁর প্রকাণ্ড চেহারা আর গোল মুখে একটা আধা হিটলার মার্কা গোঁফে ওঁকে বেশ ভারিক্কি দেখাত। স্যারের ক্লাস আমরা সেভেন থেকে পেয়েছিলাম। উনি ছিলেন বেশ লম্বা ও একটু স্থূল প্রকৃতির। ওঁর ভারী চেহারা নিয়ে ক্লাসে ঢুকে যখন বলতেন, 'চলো বৈঠো' তখন আমরা ভয়ে চুপ করে বসে যেতাম। স্যারের কালো চশমাটা খুব হাই পাওয়ারের ছিল কিন্তু আমাদের দুষ্টুমি ও বদমাইশি ঠিক চোখে পড়ত। তখন এসে পিঠে এমন এক ছয় সিক্কার থাপ্পড় মারতেন যেটা অনেকদিন মনে থাকত। আমি বরাবরই হিন্দিতে কাঁচা আর ঝা স্যার হিন্দি ছাড়া কিছু বলতেন না। আমার জন্য সেই হিন্দি ক্লাস ছিল বিভীষিকাময়। আমি অপেক্ষা করতাম কবে ক্লাস নাইনে উঠব আর হিন্দি ছেড়ে বাংলা নেব।

ক্লাস ইলেভেনে ঝা স্যার আমাদের ক্লাস টিচারও ছিলেন আর টেগোর হাউসের হাউস মাস্টারও ছিলেন। হাউসের যেকোনো সমস্যা, প্রোগামের জন্য ওঁর দ্বারস্ত হতে হত।

উনি মাঝে মধ্যে হিন্দি উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন। নিয়ম করে ঠিক সময়ে ডাইনিং হলে খাওয়ার সময় চলে আসতেন। উনি ছিলেন এক-শো ভাগ নিরামিষাশী কেন-না উনি তো মৈথেলী ব্রাহ্মণ।

আমরা স্কুল ছাড়া অব্দি ঝা স্যার স্কুলেই ছিলেন তারপর ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমরা যে যার দিকে চলে গেছি কিন্তু স্যারের স্মৃতি থেকে গেছে।

আমরা আর এক শিক্ষককে প্রথম থেকে শেষ অব্দি মানে ক্লাস টুয়েলভ অব্দি পেয়েছিলাম তিনি হলেন মিস্টার বি এল দত্ত মানে বলাই লাল দত্ত। আমরা নিজেদের মধ্যে বি এল ডি বলে ডাকতাম। উনি ছিলেন একটু লম্বাটে কিন্তু রোগা আর কালো চেহারা। যারফলে উনি হাসলে সাদা উজ্জ্বল দাঁতগুলো দূর থেকে দেখা যেত। স্যারের কালো কুচকুচে চুলটা ব্যাকব্রাশ করা যদিও কিন্তু সামনের অংশটা একটু ফুলিয়ে সিঙারার মতো করা থাকত। তিনি ছিলেন অঙ্কের টিচার। স্যার বোধহয় রাঁচিতে পড়াশোনা করেছিলেন যারজন্য চোস্ত হিন্দি বলতেন আর সুযোগ পেলেই শায়েরি বলতেন। যেমন হোলির দোল উৎসবে ওঁর শায়েরি বলা

বাধ্যতামূলক ছিল। আর আমরাও ওই কাঁচা বয়সে না বুঝেই ‘বাহ্, বাহ্, ক্যায়া বাত’ বলতাম।

স্যার অঙ্কে ভীষণ পারদর্শী ছিলেন আর জটিল ক্যালকুলাস ইত্যাদি ফটাফট ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিতেন। তাতে ভালো ছাত্রদের খুব সুবিধা হত ঠিকই কিন্তু আমার মতো এভারেজ ছাত্রদের জন্য একটু অসুবিধা হত বুঝতে। স্যার আবার অতিরিক্ত ভালো ছাত্রদের প্রতি বেশি নজর দিতেন। ওঁদের সঙ্গে অঙ্ক নিয়ে খুব উচ্চপর্যায়ে আলোচনা হত আর আমার মতো মাঝারি গোছের ছাত্ররা কিছু না বুঝে পড়ে যেতাম।

স্যারের আবার খেলাধুলাতেও খুব ইন্টারেস্ট ছিল। ভলিবল ও ফুটবল খেলতেন।

মিস্টার কে সি বিশ্বাস স্কুলে ঢুকেছিলেন আমরা স্কুলে ঢোকার পরে যদিও সনটা আমার সঠিক মনে নেই। বিশ্বাস স্যারের বাড়ি আসলে পুরুলিয়াতেই যারফলে পুরুলিয়ার ভাষার থেকে পুরুলিয়ার সব হাল হকিকত ওঁর জানা ছিল।

কে সি বিশ্বাস স্যারের নাম ছিল কৃষ্ণ চন্দ্র বিশ্বাস। উনি ছিলেন একটু বেঁটে ও কালো কুচকুচে দেখতে। মাথাভর্তি চুলগুলো ছিল কোঁকড়ানো কিন্তু অল্প ফ্যাকাশে কালো ছিল। স্যার ছিলেন ফিজিক্সের টিচার আর খুব অমায়িক ভদ্রলোক। আমাদের যেকোনো দরকারে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সাহায্য করার জন্য।

প্রথমদিকে উনি ব্যাচেলর ছিলেন যারজন্য খাওয়া-দাওয়া, গেমস পিরিয়ডে খেলা সবসময় আমাদের সঙ্গেই থাকতেন।

একটা ঘটনা এখনো মনে পড়ে। তখনকার দিনে প্রতি বছর আমাদের স্কুলে TABC টিকা (ভ্যাকসিন) দেওয়া হত ও সেটা প্রত্যেক ছাত্রের নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। সেই টিকা নেওয়ার পরে অনেকের জ্বর উঠত, অনেকে টিকা নেওয়ার দিন রাত্রে খেতে পারত না। যেহেতু সেই টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল সুতরাং কষ্ট ও ব্যথা হলেও আমরা নিয়ে নিতাম। কিন্তু আমাদের ক্লাসের এক বন্ধুর সেই ইঞ্জেকশনের প্রতি ভয় বা ফোবিয়া ছিল, সে যেকোনো উপায়ে সেই ইঞ্জেকশন না নেওয়ার চেষ্টা করত। একবার ক্লাস নাইনে আমাদেরকে টিকা দিতে লোক এসেছে আর সেই বন্ধু দৌড়ে পালিয়েছে ক্লাসের পিছনে। আর তাকে ধরার জন্য কে সি বিশ্বাস স্যার ছুটেছে। আমাদের বন্ধু একবার চেয়ারে ওঠে একবার টেবিলে আর স্যারও তাকে ধরার জন্য পিছন পিছন ছুটতে থাকে।

শেষ অব্দি কে সি বিশ্বাস স্যার নাস্তানাবুদ হয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলেন ইঞ্জেকশন দেওয়ানোর জন্য। আর আমরা গোটা ক্লাস তখন সেই দৃশ্য দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি।

আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশনে যখন নাটক প্রতিযোগিতা হত তারজন্য পোশাক, মেক-আপের যাবতীয় জিনিস বিশ্বাস স্যার টাউন থেকে জোগাড় করে আনতেন।

একবার নাটকে স্টেজে লাগানোর জন্য ঝাড়বাতি দরকার। টেগোর হাউসেরও দরকার আবার প্যাটেল হাউসেরও দরকার। দু-জনেই বিশ্বাস স্যারকে ধরেছে ঝাড়বাতি জোগাড় করে দিতে। এদিকে স্যার ছিলেন টেগোর হাউস মাস্টার সুতরাং পক্ষপাতিত্ব করে বড়ো ঝাড়বাতি টেগোর হাউসের জন্য আনলেন আর ছোটোটা দিলেন প্যাটেল হাউসকে। আমরা কয়েকজন বুঝতে পারলাম সেই পক্ষপাতিত্ব আর বেশ মজা পেলাম।

আমরা যখন নীচু ক্লাসে তখন ফিজিক্স ক্লাসে অনেক ছাত্ররা স্যারকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করত। কিন্তু পরে সেটা ঠিক হয়ে যায় ও স্যার আমাদেরকে ফিজিক্স বেশ ভালোভাবেই গুলে খাইয়েছিলেন।

আমাদের সৈনিক স্কুলে দু-জন পি.টি. বা গেমস টিচার ছিলেন। ওঁদের কথা অল্প না বললে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একজন মিস্টার জি বি সিং স্যার মানে গুরু বচ্চন সিং বজোয়া স্যার আর দ্বিতীয়জন হলেন মিস্টার মিত্র স্যার যাঁর নামটা অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম যে সুকুমার মিত্র।

মিস্টার জি বি সিং স্যারকে রোজ সকালে পি.টি.-র সময় সবার আগে হাজির হতে দেখতে পেতাম মুখে হুইশেল নিয়ে। বেশিরভাগ সময় সাদা ফুলপ্যান্টের ওপর সাদা টি-শার্ট প্যান্টে গুঁজে পরতেন। লম্বা কালো চুল মাথার ওপরে সাদা পটকা দিয়ে বাঁধা। আবার কখনো রঙিন পাগড়ি পরতেন। মুখের দাড়ি

পাকিয়ে বাঁধা থাকত। উনি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমাদের জন্য ভীষণ পরিশ্রম করাতেন। সবাইকে হাত ধরে পি.টি. ও হর্সজাম্প শেখাতেন। ওঁর শরীর খুব ফিট ছিল। স্যারের ছেলে দলজিৎ আবার আমাদের সঙ্গেই এক ক্লাসে পড়ত। সে কোয়ার্টারে থেকে ক্লাস করত।

মিস্টার জি বি সিং স্যারের একটা কমন ডায়ালগ ছিল, "If your money is lost nothing is lost. If your health is lost then something is lost and if your character is lost then everything is lost."

ডায়লগটা শুনলে আমরা হাসাহাসি করতাম। কথাটার মানে তখন এত গুরুত্ব সহকারে নিতাম না। কিন্তু এখন তার মানে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

মিস্টার মিত্র মানে সুকুমার মিত্র স্যার ছিলেন লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড চেহারার মানুষ। গলার স্বরও ছিল গুরুগম্ভীর ও কর্কশ। যারফলে মিত্র স্যারের আওয়াজ দূরের থেকে শোনা যেত। আমরা সবাই খুব ভয় করতাম ওঁকে। পি.টি. করার সময় ফাঁকি মারলে কিংবা দেরি হলে খুব রাগারাগি করতেন। মাঝেমধ্যে চড় থাপ্পর দিতেও দ্বিধা করতেন না।

স্যার খুব একটা দৌড়াদৌড়ি করতেন না। এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আমাদের ওপর নজরদারি করতেন। স্কুলের অ্যানুয়াল

ফাংশনের দিন অ্যাথলেটিক্স মিটে ওঁকে খুব দৌড় ঝাঁপ করতে দেখতাম।

আমরা যখন বেশ সিনিয়র ক্লাসে তখন মাঝে মাঝে সকালে পি.টি.-তে না গিয়ে হোস্টেলের রুমে ঘুমিয়ে থাকতাম। আর মিস্টার মিত্র সেই কায়দা বুঝতে পেরে হোস্টেলের রুমে এসে হুংকার দিয়ে ধরে নিয়ে যেতেন। সেইসব ছেলেমানুষি ঘটনা এখন মনে পড়লে খুব হাসি পায়।

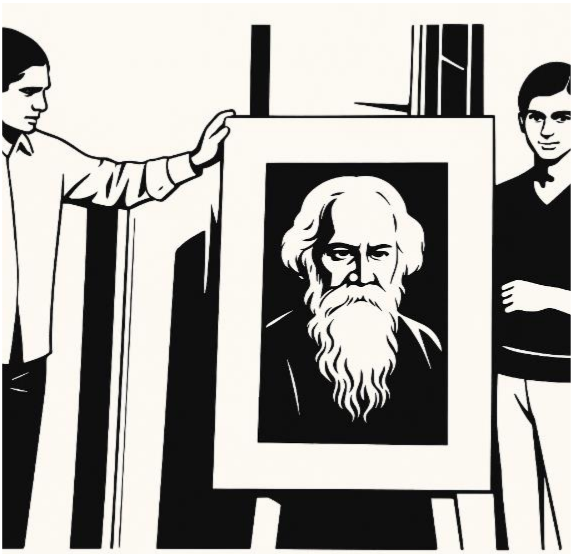

মিস্টার মিত্র স্যারকে রোজ বিকেলে একটা স্কুটারে করে টাউনের দিকে যেতে দেখতাম। একবার এক সিনিয়র দাদা স্কুল পালিয়ে টাউনে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সিনেমা দেখে ফেরার পথে রাস্তায় মিস্টার মিত্র স্যারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সামনাসামনি যখন দেখা তখন না পালিয়ে সে আত্মসমর্পণ করে

দিল। মিত্র স্যার একটা দাবড়ানি দিয়ে তাকে স্কুটারে উঠিয়ে নিয়ে এল। অত রাতে তাকে হোস্টেলের মুখে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন নিজের কোয়ার্টারে। পরেরদিন স্যার প্রিন্সিপালকে সেই সিনিয়র দাদার নামে নালিশ করে দিলেন। প্রিন্সিপাল যখন তাকে ডেকে পাঠালেন তখন সেই সিনিয়র দাদা এমন ভাব করল যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে খুব গম্ভীর মুখে সেই অভিযোগ নাকচ করে দিল। আর মিস্টার মিত্র স্যার প্রমাণ দিতে না পেরে রাগে গজগজ করে ফিরে গেলেন।

আমাদের এক আর্ট টিচার ছিলেন মিস্টার জি পি গোস্বামী—মনে হয় নামটা গুরুপ্রসাদ গোস্বামী। বেঁটে খাটো চেহারা। গায়ের রঙটা একটু মাজা শ্যামলা রঙের। হাফ হাতা সাদা শার্টটা ট্রাউজারে না গুঁজে ওপরে রাখতেন আর হাতে একটা ছোট্ট সাইজের নোটবুক। লেখা হয়ে গেলেই বুকপকেটে সেই নোটবুকটা চালান করে দিতেন তখন পকেট থেকে মোটা ঢাউস প্রেসিডেন্ট ঝরনা কলমটা উঁকি মারত। গোস্বামী স্যার সবসময় বেশ গম্ভীর হয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকতেন কিন্তু ছিলেন জাত শিল্পী। আর্টের বিষয়ে গভীর জ্ঞানী ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের শিল্পকলা শেখাতেন আর যারা সেইসব নিতে পেরেছে ও আয়ত্ত করতে পেরেছে তারা সব আজ নিজের প্রফেসন ছাড়াও শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন, আমাদের ক্লাসের সুকান্ত দাশগুপ্ত (যে

আমার তৃতীয় বই ও এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছে), শঙ্কর রাউত (যে আমার দ্বিতীয় বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছিল)।

আর্ট টিচার গোস্বামী স্যার স্কুলের আর্ট গ্যালারিটাকে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। ওয়াটার কালার, ওয়েল পেন্টিং, পোর্ট্রেট, মাটি দিয়ে বানানো স্থপতি ও স্ট্যাচু। যতদূর মনে পড়ে আমরা ক্লাস নাইনে থাকাকালীন গোস্বামী স্যার আমাদের স্কুল ছেড়ে চলে যান। তারপর ওঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা নেই।

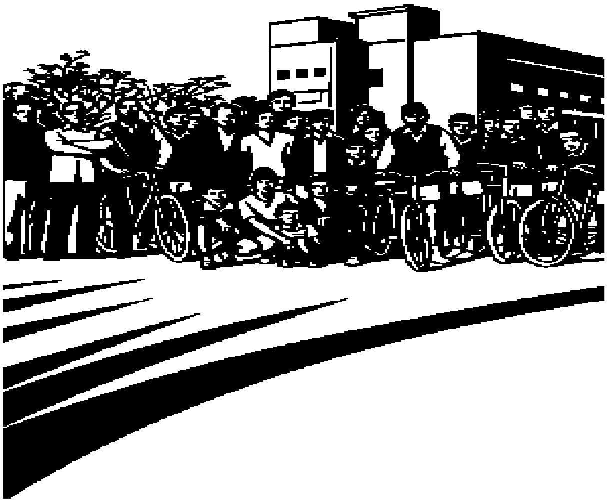

আমাদের স্কুলে আর্ট ক্লাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ক্রাফট ক্লাস ছিল। সেই ক্লাসের ইনচার্জ ক্রাফট টিচার ছিলেন মিস্টার এস সি সূত্রধর স্যার। স্যার খুব অমায়িক হাসিখুশি মানুষ ছিলেন।

শরীরটা একটু স্থূল, চুলটা ঢেউ খেলানো ব্যাকব্রাশ করা। সামনেটা যদিও টাক। সেই ক্রাফট ক্লাসে আমাদেরকে কাঠের কাজ শেখানো হত। নিজে হাতে কাঠের জিনিস বানাতে হত। আর সূত্রধর স্যার সেইসব কাজে নিজে লেগে থেকে শেখাতেন। আমাদেরকে স্যার একদমই বকাঝকা, গালিগালাজ করতেন না। সবসময় হাসিমুখে আমাদের সমস্যা শুনতেন। আমাদের কাছে উনি যেন ছিলেন এক পিতৃস্থানীয় গার্জেন।

আমরা উনিশ-শো আশিতে টুয়েলভ পাশ করে স্কুল ছাড়া অব্দি সূত্রধর স্যারকে পেয়েছিলাম। এখনও মনে পড়ে ওঁর সেই ব্রাউন কালারের কোট প্যান্ট ও সেই হাতকাটা সোয়েটার শীতকালে যেটা পরে আমাদের ক্লাস নিতেন।

আমাদের স্কুল লাইব্রেরি

আমাদের সৈনিক স্কুলের লাইব্রেরিটা ছিল ঠিক স্কুল বিল্ডিঙের শেষপ্রান্তে। তারমানে স্কুল বিল্ডিঙটা ছিল চতুর্ভুজ আকারের। লাইব্রেরিটা সেই চতুর্ভুজের একটা বাহু অধিকার করে বসে ছিল। লাইব্রেরিতে ঢোকার মুখেই নীচের দিকে কিছু সিঁড়ি নেমে গেছে তারপর একফালি খোলা জায়গা যেখানে দু-তিনটে লম্বা ডেস্কের ওপর দৈনিক ইংরেজি খবর কাগজ রাখা থাকত পাঠকদের জন্য। প্রত্যেকটা খবর কাগজই ইংরেজি। আর নীচের মেঝেতে একটা ঢাউস মার্কা 'সুলেখা কালির' বোতল রাখা থাকত ছাত্রদের ফাউন্টেন পেনে ঢোকানোর জন্য। আমাদের স্কুল জীবনে বলপেনের চল ছিল না। যারজন্য ফাউন্টেন পেন বা ঝরনা কলমই ছিল আমাদের ভরসা যেটাতে গাড়িতে পেট্রোল ভরার মতো ঠিক সময়ে কালি ভরতে হত। পেনে কালি ভরা ছিল এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যপার। কালি ভরানো মানে দুই হাতে নীল কালি দিয়ে স্নান করা। সেই লাইব্রেরির বোতল থেকে ক্লাস মনিটর দোয়াতে করে কালি ভরে নিয়ে আসত ক্লাসের সবার জন্য। আমরা সেই দোয়াত থেকে নিজের কলমে কালি ভরাতাম। আমাদেরকে শুধু নীল কালিই দেওয়া হত ব্যবহার করার জন্য অন্য রঙের কালি ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না। একটা প্লাস্টিকের ড্রপার থাকত কালি ভরানোর জন্য কিন্তু সেই ড্রপার

হাবিস হতে বেশি সময় লাগত না তখন সেই দোয়াত থেকে কলমে সোজা ঢেলে নিতে হত।

সেই করিডোরটা পার হলেই মেইন লাইব্রেরি। সেখানে একটা মস্ত হলঘরের মধ্যে চার পাঁচটা লাইনে সারি সারি লোহার খোলা বুক সেলফ থাকত। আর সেই বুক সেলফে বিভিন্ন ধরনের বই সাজানো থাকত। একদিকে পাঠ্যপুস্তক, একদিকে গল্পের বই, একদিকে বিভিন্ন ধরনের জেনারেল নলেজের (সাধারণ জ্ঞানের) বই রাখা থাকত। বেশিরভাগ বই ছিল ইংলিশে।

আর সেই হলঘরের মাঝখানে লম্বা লম্বা কয়েকটা টেবিল ও চেয়ার সাজানো থাকত পড়াশোনা করার জন্য। টেবিলগুলোতে রাখা থাকত বিভিন্ন ধরনের সাময়িক পত্রিকা। যেমন, 'কম্পিটিশন মাস্টার', 'কেরিয়ার গাইড', 'সানডে', 'সিনে ব্লিজ', 'রিডার্স ডাইজেস্ট', 'ধর্মযুগ' (হিন্দি), বাংলা 'দেশ' পত্রিকা ইত্যাদি। আরো হয়তো কিছু থাকত যেগুলো মনে নেই। আর কয়েক ধরনের ইংলিশ ও হিন্দি খবর কাগজ রাখা থাকত। সেখানে বসে লাইব্রেরি ক্লাস কিংবা অফ পিরিয়ডে আমরা বসে বই ও পত্রিকা দেখতাম। যতদূর মনে পড়ে সেই হলঘরের দক্ষিণ দিকে দুটো মাঝারি আকারের রুম ছিল। প্রথম রুমটা লাইব্রেরি অফিস রুম যদিও কিন্তু চারিদিকের আলমারিতে বইয়ে ঠাসা। ভিতরের রুমে আলমারিগুলো ছিল গদরেজের যেগুলো তালা মারা থাকত। সেখানে খুব নামি-দামি বই রাখা থাকত। যেমন,

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা ও রঙিন অ্যাটলাস ইত্যাদি। আর একটা খুব সুন্দর জিনিস ওখানে দেখতাম সেটা হল সঠিক অক্সফোর্ড ইংরেজি শেখার জন্য অডিও ফোন। সেটা চালাতে হলে লাইব্রেরিয়ানের পারমিশন লাগত। সেটা চালিয়ে দিলে ব্রিটিশ উচ্চারণে ইংলিশ শেখা যেত। অনেক ছাত্ররা ভিড় করে ওটা শুনত। আমি শুনে কৌতূহল মিটিয়েছি কিন্তু শেখার চেষ্টা করিনি যারফলে এখন আমার ইংরেজি উচ্চারণ পাতি বাঙালি মার্কা। তখন মন দিয়ে ওইসব শিখলে আজকে শশী থারুরের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে পারতাম!

গোটা সপ্তাহ জুড়ে মাত্র একটা ক্লাস লাইব্রেরির জন্য বরাদ্দ থাকত। সত্যি বলতে কী আমার জন্য সময়টা খুবই কম ছিল। এই লাইব্রেরিটা আমার খুব প্রিয় ছিল। কত ধরনের বই, বিভিন্ন জায়গার পত্রিকা সেসব ছুঁয়ে দেখতে দেখতেই সময় পার হয়ে যেত। এই লাইব্রেরির ভিতরে আমার কাছে সবচেয়ে লোভনীয় ছিল বাংলা বইয়ের র‍্যাকগুলো। সেখানে দেখতাম অনেক ধরনের বাংলা বই কিন্তু বাংলা বই ইস্যু করা যাবে না। ইংলিশ বই নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু বাংলাতে *আম আঁটির ভেঁপু, পথের পাঁচালী, অপরাজিতা, ড্রাকুলা, শরদিন্দু অমনিবাস,* নীহাররঞ্জন গুপ্তের *কিরিটী অমনিবাস,* বিমল মিত্রের *আসামী হাজির,* এই লাইব্রেরি থেকে পড়েই আমার বই পড়ার নেশা বাড়িয়ে দিয়েছিল। গোয়েন্দা গল্পের প্রতি যে মোহ ছিল স্কুল

জীবনে তার হাতেখড়ি এখান থেকেই। স্কুলে ঢোকার আগে অব্দি গোয়েন্দা গল্প মানে স্বপন কুমারের বটতলার বইতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আমাদের জন্য প্রতি সপ্তাহে ইংরেজি বই ইস্যু করে নিয়ে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। যারফলে বই নিয়ে যেতাম তারপর আস্তে আস্তে শেষ করতাম। দরকার হলে ডিকশনারি (অভিধান) দেখতাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার বেশ কিছু ইংরেজি বইও পড়া হয়ে গেল। আরম্ভ করেছিলাম এনিড ব্লাইটন দিয়ে। সেগুলো ছিল সোজা ভাষায় রোমাঞ্চকর গল্প। সেই কৈশোর বয়সে সেইসব লেখা খুব রোমান্টিক লাগত।

একটা সময় ভাবতাম বড়ো হয়ে আমি লাইব্রেরিয়ান হব তাহলে গোটা দিন লাইব্রেরিতে বসে বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই পড়তে পারব।

একদিন ক্লাস ফাইভে একটা মোটা বাংলা গল্পের বই জোগাড় করলাম (কে দিয়েছিল মনে নেই) সেটা সন্ধের ক্লাস প্রেপে লুকিয়ে পড়ছিলাম। সবে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম ব্যাস, হঠাৎ পিছন থেকে আমাদের লাইব্রেরিয়ান এসে বইটা ছিনিয়ে নিলেন হাত থেকে। খুব রাগারাগি করলেন আর বললেন, ‘এই বই পড়ার বয়স তোমার এখনো হয়নি’। বলেই হাত থেকে বইটা নিয়ে চলে গেলেন। বইটার নাম ছিল *আদর্শ হিন্দু হোটেল*।

আমরা স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবছর স্কুলের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন মিস্টার এন সি রায় (নির্মাল চন্দ্র রায়)। ওঁর আচার-ব্যবহার মনে এমনভাবে মনে দাগ কেটে গিয়েছিল যে উনি চলে যাবার পর লাইব্রেরিয়ান কে ছিলেন আজ আমার মনে নেই।

মিস্টার এন সি রায় ছিলেন ফর্সা কিন্তু মুখে কোন দাড়ি গোঁফ ছিল না। সবসময় একটা হাই পাওয়ারের কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরতেন। চশমাটা এত পাওয়ার ছিল যে ওঁকে চশমা ছাড়া আমি কোনোদিন দেখিনি। ট্রাউজারের ওপর হাফ শার্টটা গোঁজা থাকত না প্যান্টের ওপর থেকে ঝুলত। সাধারণত উনি খয়েরি রঙের চামড়ার চটি পরে আসতেন। হাইটে একটু খর্বাকৃতি। আর মুখে সবসময় চারমিনার সিগারেট ঝুলত (তখন স্কুল করিডরে স্যারেরা অনায়াসে সিগারেট খেতেন) আর ক্রমাগত কেশে চলতেন। ওঁর শুকনো কাশির আওয়াজ শুনলেই বুঝতাম যে মিস্টার এন সি রায় আসছেন। আমাদের ওই ছেলেবেলায় ওঁকে দেখলে পুরো রাহুল দেববর্মনের মুখটা মনে আসত। আড়ালে আমরা ওঁকে আর ডি বর্মনই বলতাম। মাঝেমাঝে ওঁকে ক্রিকেট খেলার ফিল্ডে ক্রিকেট খেলতে দেখতাম।

লাইব্রেরিতে মিস্টার এন সি রায়ের নজরদারি খুব কড়া ছিল। ওঁর চোখ সবদিকে থাকত। কে কী করছে, কে কোন বইটা ঘাঁটছে। লাইব্রেরি থেকে বই নিলে এন্ট্রি করা আবার ঘুরিয়ে দিলে

এন্ট্রি করা সব একা হাতেই করতেন। অনেকের আবার বই চুরি করা বদভ্যাস ছিল। সেটার দিকেও স্যারকে নজরদারি করতে হত।

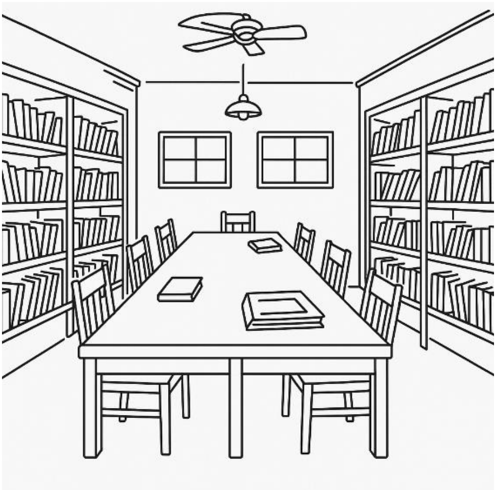

আমাদের স্কুলের সব ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য যেসব খাতা দরকার হত সব ক্লাসও সময় অনুযায়ী লাইব্রেরি থেকে দেওয়া হত। তারমানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস মনিটর খাতার জন্য আবেদন করত ক্লাস টিচারকে তারপর সেই কাগজ লাইব্রেরিয়ানকে দেখালে একসঙ্গে সবার ‘বঙ্গ লিপি’ অথবা ‘লিপিকা’ খাতা চলে আসত। কিছু ছিল রুল টানা খাতা আর কিছু খালি সাদা পাতা প্রধানত অঙ্কের জন্য। সেইসব ‘বঙ্গ লিপি’ খাতা হাফ সাইজের ছিল আবার লম্বা ফুল সাইজেরও ছিল। এই ‘বঙ্গ লিপি’ নামটার সাথে অনেকের অনেক স্মৃতি লুকিয়ে আছে। এটা

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় সবার মনটা একবার হলেও অতীতে স্কুলের ক্লাসরুমটাতে চলে যাবে, তাই না?

এই খাতা ঠিকমতো ইস্যু করাও লাইব্রেরিয়ানের কাজ ছিল।

আমরা যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন আমাদের ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে একবার ঠিক হল টিফিন টাইম (মিল্ক ব্রেক) অব্দি ছাত্ররা শিক্ষক হয়ে বিভিন্ন ক্লাস নেবে প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে। যারা যেই বিষয়ে পারদর্শী তাদেরকে সেই ক্লাস নিতে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন যে যার ক্লাসে শিক্ষক হয়ে চলে গিয়েছিল আর আমার ভাগ্যে সেদিন জুটেছিল লাইব্রেরিয়ান হওয়ার সুযোগ। আমি বেশ খুশিমনে কয়েক ঘণ্টা লাইব্রেরিয়ান হয়ে সময় কাটাতে পেরে ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম।

সেই প্রকাণ্ড লাইব্রেরি আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। এখান থেকেই তো অনেক কিছু শিখেছি, এখান থেকেই তো ওই এন সি রায় স্যারের থেকে বাইরের বিভিন্ন বই পড়ার উৎসাহ পেয়েছিলাম। তা নাহলে কী এই পাঁচ দশক পরেও ওই লাইব্রেরি ও লাইব্রেরিয়ানকে মনে থাকে?

কলকাতা প্যারেড

ছাব্বিশে জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে আমাদের স্কুলে খুব বড়ো আয়োজন হত। সেদিনের কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি অনেকদিন ধরে চলত। আমাদের স্কুলের কিছু ছেলেকে গণতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে প্যারেড করতে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করা হত। আর সিনিয়র গ্রুপের অধিকাংশ ছেলেদেরকে পাঠানো হত কলকাতায় গনতন্ত্র দিবসে রাজ্যপালের উপস্থিতিতে প্যারেড করতে যাওয়ার জন্য। সেখানে তারা আমাদের সৈনিক স্কুলকে প্রতিনিধিত্ব করত। আমরা যখন ক্লাস টেনে তখন কলকাতা যাওয়ার সুযোগ পেলাম গণতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ করার জন্য। আমরা দুই বার কলকাতা যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমবার আমরা যখন ক্লাস টেনে আর দ্বিতীয়বার যখন আমরা ক্লাস ইলেভেনে।

আমাদেরকে যাওয়ার আগে একটা করে এন.সি.সি. অফিস থেকে ব্যাগ দেওয়া হত। রাকস্যাক ব্যাগ—যেটাতে সবকিছু ক্যাম্পের সরঞ্জাম ঢুকে যেত। সেই সব জিনিসপত্র নিয়ে আমরা পুরুলিয়া স্টেশন থেকে হাওড়া যাওয়ার ট্রেন ধরতাম সঙ্গে থাকতেন আমাদের কোনো টিচার ইনচার্জ। আমরা যেহেতু সৈনিক স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করতাম তাই ট্রেনে আসা যাওয়ার

সময় খাকি এন.সি.সি.-র ড্রেস পড়াই নিয়ম ছিল। আমরাও খুব ফুর্তি করে ট্রেনে করে রাত্রের ট্রেনে কলকাতা যেতাম।

আমি মফস্সলের ছেলে তার আগে কোনোদিন কলকাতা যাইনি। আমার কাছে তখন কলকাতা স্বপ্ননগরী। তাও আবার ওই কৈশোর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতা যাওয়া মানে বিরাট ব্যাপার। সাতদিন আগে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হত। থাকতাম ফোর্ট উইলিয়ামের আশপাশে কোনো আর্মি ছাউনিতে। সেখানে আমার সবাই একসঙ্গে ব্যারাকে থাকতাম। রোজ সকালে সেই সাদা এনামেলের প্লেটে ব্রেকফাস্ট খেতে হত। সেই ব্রেকফাস্টে থাকত চারটে পুরি আর আলুর তরকারি। আর এক বিরাট এনামেলের মগে মগ ভর্তি গরম চা। সেই জানুয়ারি মাসের ঠাণ্ডাতে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে গরম চা মন্দ লাগত না। সেই খেয়ে আমরা বেলা দশটা অব্দি রেড রোডে দূর থেকে ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়াল দেখতে দেখতে ফাইনাল দিনের জন্য মার্চপাস্ট প্রাকটিস করতাম। ওখানে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হত। অতটা রাস্তা আমরা কুচকাওয়াজের মহড়া দিতাম কিন্তু ক্লান্ত বোধ করতাম না। আমাদের কুচকাওয়াজের মহড়া শেষ হত ময়দানে গিয়ে। দূর থেকে দেখতে পেতাম ইডেন গার্ডেন, আকাশবাণী ভবন ইত্যাদি।

তারপর বেলা দশটা এগারোটার পর আমরা সবাই ছাড়া গোরু। যা খুশি করো কেউ কিছু বলার নেই। রাত্রে যখন খুশি এসো কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। আমরা তখন কৈশোরের শেষ কোঠায় সবে যৌবনের দোরগোড়ায় প্রবেশ করছি। শরীরে অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য আর মনে প্রচণ্ড কৌতূহল। আমরা তখন কলকাতা চষে বেড়াতাম, এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াতাম। এসপ্লানেডের আশপাশে যত সিনেমা হল ছিল সব হলে সিনেমা দেখে বেড়াতাম। এমনকী একদিনে তিনটে শো দেখে ব্যারাকে ফিরতাম। তখনই সিনেমার ম্যাটিনি শো থেকে নাইট শোয়ের টাইমগুলো জানতে পেরেছিলাম যে প্রথম শো তিনটে থেকে ছটা, দ্বিতীয় শো ছটা পনেরো থেকে ন-টা পনেরো, আর শেষ শো সাড়ে ন-টা থেকে সাড়ে বারোটা অব্দি। যারজন্য একটা হলে সিনেমা দেখে বার হয়ে আর একটা হলে দৌড়াদৌড়ি করে গেলে দেখা যেত। ওই ক-দিন কলকাতায় থাকার সময় আমরা এসপ্লানেডের আশপাশে সব সিনেমা হলের নাম ও

নাড়িনক্ষত্র জেনে যেতাম। এসপ্লানেড চত্বরটা এলোপাথাড়ি ঘোরা, টুকটাক কেনাকাটা আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সস্তার খাওয়ার মধ্যে তখন একটা আলাদা আমেজ ছিল। ফুচকার দাম এসপ্লানেডে একরকম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে আর-একরকম তখনই টের পেয়েছিলাম।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার্কে বিকেলে বসে কৈশোরের শেষবেলায় নতুন নতুন জিনিস দেখতাম আর নিজেদেরকে বড্ড অসম্পূর্ণ মনে হত। মনে হত ছেলেদের রেসিডেনসিয়াল স্কুলে থেকে যেন জীবনে অনেক কিছু মিস করছি।

তখনকার দিনে অ্যাডাল্ট সিনেমা হলে আঠারো বছরের নীচে কাউকে ঢুকতে দিত না সিনেমা দেখতে। এদিকে তখন আমাদের বয়স যদিও আঠারো হয়নি কিন্তু মানসিকভাবে পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিলাম। কৌতূহল সম্বরন করতে না পেরে “দ্যাট ম্যান’স বোল্ট” (যেটা ছিল অ্যাডাল্ট সিনেমা) দেখার জন্য নিউ এম্পায়ার সিনেমা হলে লাইনে দাঁড়িয়ে ও বিফল হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল ঢোকার অনুমতি না পেয়ে। তখন তো বয়স বিচার করার মাপকাঠি ছিল দাড়ি-গোঁফ বার হয়েছে কি না। বয়সের পরিচয় পত্র দেখানোর চল তখনও চালু হয়নি। আমাদের সঙ্গের একজন নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখানোর জন্য সিগারেট মুখে নিয়ে গেটের কাছে অব্দি এসে ফেলে দিয়ে টিকিট দেখিয়ে বুক

ফুলিয়ে ঢুকে গেল অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখতে। তখন আবার সিনেমা হলে সিগারেট খাওয়া যেত লুকিয়ে।

সেই সময় কলকাতার ফুটবল খেলা দেখেছি, উঁকি মেরে বাইরে থেকে রেসকোর্সে ঘোড়াদৌড় দেখেছি। হঠাৎ অচেনা জায়গায় পৌঁছে গিয়ে মুখে অতিরিক্ত চড়া মেক-আপ করা নারীদের দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে সেটা একটা নিষিদ্ধ পল্লী। রাতের নগরী কলকাতাকে দেখার সুযোগ তখনই হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন কলকাতায় থাকার পর রাতারাতি যেন অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছিলাম।

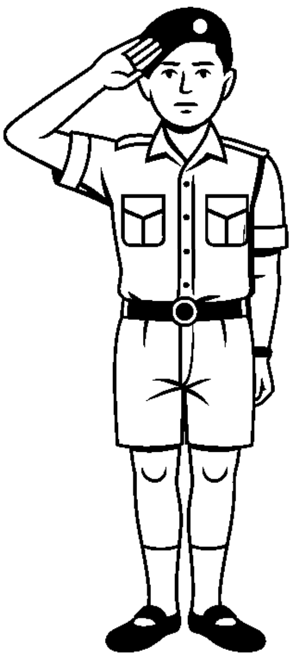

আমাদের কুচকাওয়াজের মহড়া চলাকালীন আমাদের পাশেই কোনো গার্লস স্কুলের একটা গ্রুপ ছিল। আমরা মহড়া দিতাম আর কৈশোরের উত্তেজনা অনুভব করতাম। অনেকে কোনো সুন্দরীকে দেখে স্বপ্নের জাল বুনত আর মহড়ার শেষে বিরহ মনে সেনা ছাউনিতে ফিরে আসত। আর অনেকে সেই মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত সব আচরণ করত। এখন সেসব ভাবলে লজ্জাও লাগে আবার অপরিণত বয়সের আচরণের জন্য হাসিও পায়।

ছাব্বিশ জানুয়ারি ফাইনাল দিনের সাত সকালে আমরা কড়কড়ে ইস্ত্রি করা খাকি প্যান্ট-শার্ট, নেভি ব্লু সোয়েটার, মাথায় কালো ক্যাপ যেটার ওপরে লাগানো থাকত ঝুঁটি মুরগির পালকের ঝুঁটির মতো। ওটাকে বোধহয় ‘হ্যাকেলস’ বলা হত। কালো জুতো এমন চকচক করত যাতে নিজের মুখ দেখা যায়। সঙ্গে নীল রঙের মোজা হাঁটুর নীচ অব্দি টানা। সেটাকে স্টকিং বলা নিয়ম ছিল। সবাই সেদিন উত্তেজিত মার্চপাস্ট করার জন্য। রেড রোডের দু-পাশে সেদিন বাঁশ বেঁধে কর্ডন করা হত যাতে রাস্তার পাশে দর্শকদের উপচানো ভিড় রাস্তায় না আসতে পারে। সেই ভিড়ের মধ্যেই দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আমাদের অনেকে বন্ধুর মা-বাবা ও ঘরের লোকেরা। সেইসব দর্শক দেখে আমাদেরও উত্তেজনা বেড়ে যেত আর সবাই তাদের সাধ্যমতো ভালো পারফরমেন্স দিত। সেই মার্চপাস্টে সেদিন সামরিক

বাহিনীর প্রতিটা শাখা প্রতিনিধিত্ব করত। সাঁজোয়া গাড়ি, বিভিন্ন থিম অনুযায়ী ট্যাবলয়েড যেত গাড়ি নিয়ে। আর আমরা গর্বের সঙ্গে লেফট-রাইট, লেফট-রাইট করে মেইন মঞ্চ অব্দি যেতাম যেখানে অনেক মান্যগণ্য লোকের সঙ্গে রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রি স্যালুট নিতেন। আমরা সেই জায়গাটায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্লেটুনেরক্যাপ্টেন নিজে স্যালুট দিয়ে "ডাইনে দেখ" বলে চেঁচাত। আর আমরা তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে ডান দিকে ঘাড় ঘোরাতাম আর বেশি উৎসাহিত হয়ে লেফট-রাইট করতে করতে না বুঝেই পার হয়ে যেতাম। তারপর আফশোস হত মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে দেখতে পেলাম না বলে। কেন-না দূর থেকে মঞ্চের ওপর অত গণ্যমান্য লোকের ভিতর বুঝতেই পারতাম না যে রাজ্যপাল মহাশয় কোনজন।

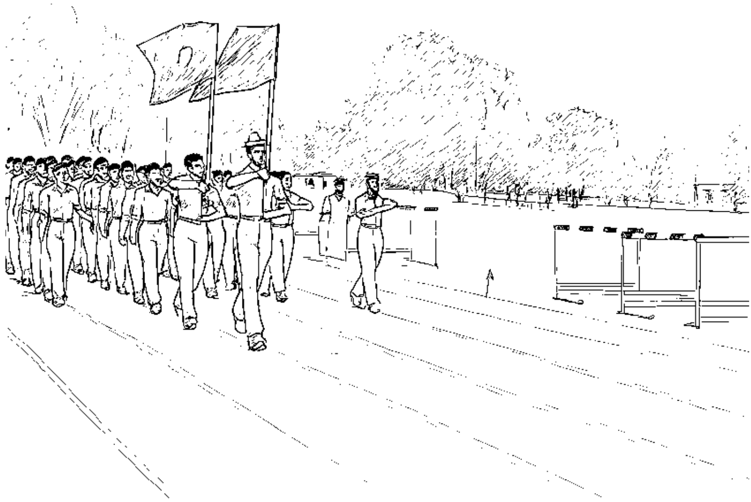

সেই ছাব্বিশ জানুয়ারি সকালটা খুব ভালো লাগত কিন্তু মার্চপাস্টের পর মনটা খারাপ হয়ে যেত কেন-না সেদিনই রাত্রের ট্রেনে আমাদের আবার ফিরতে হত পুরুলিয়াতে। ছাব্বিশ জানুয়ারির আগের সাতদিন এত আনন্দ-ফুর্তি, মস্তি করে কাটানোর পর আবার সেই গতানুগতিক সৈনিক স্কুল হোস্টেল জীবনে ঢুকতে হবে ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু নিয়মানুযায়ী ফিরতেই হবে। স্কুলে ফিরতাম সঙ্গে নিয়ে আসতাম অনেক মধুর স্মৃতি যা ভোলার নয়।

আমাদের গোপালদা

কিছু কিছু মানুষের চেহারা দেখে বোঝা যায় না তাদের বয়স কত। ঠিক সেইরকম চেহারার লোক ছিল আমাদের গোপালদা। ছোটোখাটো দেখতে রোগাই বলা চলে। গায়ের রং ফর্সা, মুখে দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন নেই যারজন্য মুখে ওপর পুরোনো বসন্তের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা দিত। একদিকে সিঁথি করে কুচকুচে কালো চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা থাকত। বেশিরভাগ সময় সাদা ধোপদুরস্ত শার্ট-প্যান্ট পরেই থাকত। শার্টটা প্যান্টের বাইরে ঝুলত। ফুল শার্টের হাতটা একটু ভাঁজ করা যারজন্য ছোট্ট কালো বেল্ট থাকা ঘড়িটা হাতের কবজিতে উঁকি মারত। কখনো-সখনো আবার খাকি প্যান্ট শার্ট পরে আসত। বাঁ-হাতের একটা নখ শখ করে লম্বা করে রাখত গোপালদা। আমরা সেই লম্বা নখটা দেখে আকর্ষিত হতাম আর কল্পনা করতাম যে কবে আমরা ইচ্ছামতো নিজের নখটাকে লম্বা করতে পারব।

একাই গোপালদা গম্ভীর মুখে কাজ করে যেত আমাদের স্কুলের ছোট্ট হাসপাতালে। আমাদের যাবতীয় রোগ সংক্রান্ত কাজ ও কৌতূহল গোপালদাই মেটাত। গোপালদার কাজ যে আদৌ কী সেটা আমরা জানতামও না আর জানার চেষ্টাও করতাম না।

আমাদের হাসপাতালের পার্ট টাইম ডাক্তার একদিন অন্তর দুপুরে আসতেন। সাধারণত ডাক্তারবাবু সোম, বুধ, শুক্র আসতেন একটা ক্রিম রঙের এম্বাসেডর গাড়িতে। দুপুর দুটো থেকে চারটে অব্দি থাকতেন রোগী দেখতেন তারপর যাবতীয় নির্দেশ গোপালদা আর ফার্মাসিস্টকে দিয়ে চলে যেতেন। বাকি সময় আউটডোর, ইনডোর, ইমারজেন্সি সব তারাই সামলাত।

ডাক্তারবাবু প্রথমে এসেই চেয়ারে বসেই 'গোপাল' বলে ডাকতেন। আর আমরা লাইন করে বারান্দাতে অপেক্ষা করতাম। ডাক্তারবাবু এলে একে একে দেখাতাম। বড়ো একটা খাতায় আমাদের নাম লিখে ছোট্ট একটা কাগজে ডাক্তারবাবু ওষুধের নাম লিখে দিতেন। আমরা ওই কাগজটা গোপালদাকে দেখাতাম আর গোপালদা ডিসপেনসারি থেকে প্রয়োজন অনুসারে ওষুধ দিত। সাধারণত জ্বর, ডিসেন্ট্রি আর কাটা-ছেঁড়া এসব কেসই বেশি থাকত। খেলাধুলা করতে গিয়ে চোট লাগা কিংবা মচকে যাওয়া কেস হলে গোপালদার ডাক পড়ত আর পরিষ্কার করে ড্রেসিং করা কাজটা গোপালদাই করত। পরে জানতে পেরেছিলাম যে গোপালদার পোস্টটা হচ্ছে ড্রেসার।

স্কুলের হাসপাতালে সাধারণত যেত তিন রকমের রোগী। এক হচ্ছে যারা সত্যিকারের অসুস্থ, দ্বিতীয় হচ্ছে যারা ছোটো অসুখকে বড়ো অসুখের ভান করে কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য যেত। ভর্তি হতে পারলে কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম পাওয়া

যেত, ভালো-মন্দ খাওয় হত। আর তৃতীয় গ্রুপ হচ্ছে পায়ে ছোটো কাটা থাকলে কিছুদিনের জন্য EP পাওয়ার জন্য। EP মানে Excuse PT, সেটা পাওয়া গেলে সকালবেলা ব্যায়াম মানে PT করার থেকে রেহাই পাওয়া যেত। ডাক্তারবাবু কাগজে নির্দিষ্ট যতদিন লিখে দিত ততদিনই PT করা থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

আমাদের ফার্মাসিস্ট ছিলেন এক কালো বেঁটেখাটো, মোটা ভদ্রলোক। চুলগুলো ছোটো ছোটো করে কাটা আক্ষরিক অর্থে যথার্থ 'বাটি ছাঁট'। ওঁর নাম কেউ জানত না 'ফার্মা' বলেই ডাকতাম আমরা, আর আড়ালে 'মোটু' বলে ডাকতাম। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম যে ওঁর উপাধি (অরুণ??) 'বিশ্বাস'।

উনি হাসপাতালেই একটা রুমে একাই থাকতেন আর রোজ তিনবেলা খাওয়ার সময় হাসপাতাল থেকে ডাইনিং হল হেঁটে হেঁটে যেতেন আবার খাওয়ার পরে ঘুরে আসতেন। ওঁকে আসতে দেখলেই বুঝতাম আমাদের খাওয়ার সময় হয়েছে। উনি যদিও ফার্মাসিস্ট ছিলেন কিন্তু ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সবাই গোপালদার কাছেই যেত।

গোপালদা থাকত একটু দূরে স্টাফ কোয়ার্টারে, একাই থাকত। আর একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর যখন কৈশোর উঁকি মারছে তখন আমরা গান শোনার জন্য পাগল। মনের মধ্যে রোমান্স বাসা বাঁধছে।

সত্তর দশকে বুধবার রাত্রে ‘বিনাকা গীতমালা’ হত সেই আমিন সাহানির সুন্দর ভাষ্য কিন্তু শোনার তো উপায় নেই। আমাদের হোস্টেলে রেডিয়ো রাখার অনুমতিও ছিল না আর রেডিয়ো আনার সামর্থও ছিল না। দূর থেকে গান ভেসে এলে কান পেতে শোনার চেষ্টা করতাম। সেইরকম সময় খবর পেলাম যে গোপালদার বাড়িতে বুধবার সন্ধেতে যেতে পারলে ‘বিনাকা গীতমালা’ শোনা যাবে। কিন্তু সেই সময় সন্ধের ‘প্রেপ-ক্লাস’ চলে সুতরাং ক্লাসরুম থেকে পালিয়ে যেতে হবে তারপর ‘বিনাকা গীতমালা’ সাড়ে আটটায় শেষ হওয়ার আগেই আস্তে করে ডাইনিং হলে ডিনারের জন্য ঢুকে যেতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। আমরা গুটিকয়েক ছাত্র তখন থেকে বুধবার গোপালদার বাড়িতে চলে যেতাম ‘বিনাকা গীতমালা’ শোনার জন্য। স্কুল ফিল্ডটা পার হয়ে স্যারেদের কোয়ার্টার পার করে ডানদিকে একতলা কয়েকটা ছোটোখাটো কোয়ার্টার ছিল। সেই কোয়ার্টারের ব্লকের প্রথম ঘরটা ছিল আমাদের গোপালদার। গোপালদা একাই একটা রুমে থাকত খুব পরিপাটি ভাবে। আমরা বারান্দাতে দাঁড়িয়ে বিনাকা গীতমালার গান শুনতাম। আমাদেরকে দেখে গোপালদার বোধহয় সহানুভূতি হত তখন তার ঘরের দরজাটা খুলে আমাদেরকে রেডিয়োটা দেখার সুযোগ দিত। তখন সেই খোলা দরজা দিয়ে গানের আওয়াজ বেশ স্পষ্টভাবে শোনা যেত আর আমরা হিন্দি গানে মৌজ হয়ে আরো মশগুল হয়ে যেতাম। বুধবার একদিকে বিনাকা গীতমালার আহ্বান আর

উলটোদিকে প্রেপ ফাঁকি মারার জন্য উৎকণ্ঠা। কিন্তু জীবনে রিস্ক না নিলে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না সুতরাং সেদিন বিনাকা গীতমালার জয় হত! ডিসেম্বরের শেষ বুধবার ফাইনাল বিনাকা গীতমালার প্রোগ্রাম হত, যেদিন গোটা বছরের শ্রেষ্ঠ গানগুলো শোনানো হত। শ্রোতাদের ভোট নিয়ে সেইসব গান নির্বাচন করা হত। আমরা সেদিন দুরু দুরু বুকে আমিন সাহানির গম্ভীর মধুর গলায় বিনাকা গীতমালা শোনার জন্য গোপালদার ঘরে গুটিগুটি পায়ে হাজির হতাম। আমাদের মতো কিছু সিনিয়র ও কয়েকজন জুনিয়র ছাত্র গানপ্রেমিকও সেদিন সেখানে হাজির হত। কিন্তু সেইদিনের জন্য সিনিয়র জুনিয়র ভেদাভেদ ছিল না। সেদিন সব 'সাত খুন মাফ'!

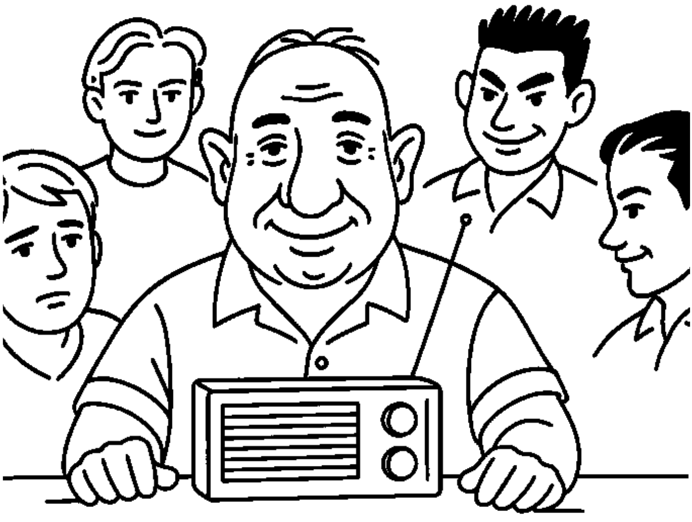

সেইসব অ্যাডভেঞ্চার ভোলার না। পরবর্তীকালে স্কুল থেকে বার হওয়ার পর অনেক ‘বিনাকা গীতমালা’ শুনেছি, ক্যাসেট সিডিতে বন্দি হওয়া পুরোনো গানগুলো শুনেছি কিন্তু সেইরকম ভালো আর কোনোদিন লাগেনি। সেটা ছিল লুকিয়ে প্রেম করার মতো মিষ্টি।

“উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে...”

‘ম্যায় ক্যা করু রাম মুঝে বুড্ঢা মিল গেয়া...’ এই গানের কলিটা বেশ খোশমেজাজে গাইছিল সৈনিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরেরদিন আমার বয়সেরই এক রুমমেট। গানটা আমার খুব চেনা। মানে ছোটোবেলায় গানটা না বুঝলেও গানটা শুনলে আমি নাচতাম আর বাড়ির বড়োরা সেই নাচ দেখে খুব ফুর্তি পেত। গানটা শুনে সেই ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, ‘এই তোর নাম কী? কোথায় থেকে এসেছিস?” সে বলল, “হাজারিবাগ”। আমি বললাম, “আমি হাজার দুয়ারী শুনেছি কিন্তু ‘হাজারিবাগ’ শুনিনি”।

আমার নাম, “অলোক রায়, রায় টাইটেল নিশ্চয় শুনেছিস যেমন সত্যজিৎ রায়”। উত্তরটা শুনে আমি ফিক করে হেসে দিয়েছিলাম কিন্তু ছেলেটাকে ভালো লেগে গিয়েছিল। আমারই বয়সের ছেলেটি কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। মুখটা একটু লম্বা, চুলগুলো অবাধ্য জোরকরে উলটোদিকে আঁচড়ানোর জন্য চুলের গোঁড়াতে মোচড়টা প্রথমেই চোখে পড়ে। কিন্তু চোখদুটো বড্ড উজ্জ্বল যেন কথা বলে। এই ছিল আমার সঙ্গে অলোকের প্রথম পরিচয় পর্ব।

সেই অলোক মোটামুটি সারা স্কুল জীবনেই ছিল আমার রুমমেট আর আমার ভালো-মন্দের সঙ্গী, অনেক কিছুর হাতেখড়ি

দেওয়ার মাস্টার! সে ছিল খুব ঠোঁটকাটা, স্পষ্টবাদী আর আমি ছিলাম মুখচোরা লাজুক। সে ছিল তার্কিক, যুক্তি দিয়ে তর্ক করতে পারত। সে ছিল খুব পজিটিভ সবসময় ভালোটাই চিন্তা করত আর সবচেয়ে দামি গুণ সে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে মোটিভেট করতে পারত। আমরা দু-জন দুই মেরুর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দু-জনের বন্ধুত্ব টিকে গিয়েছিল কোন রসায়নে তা আমার জানা নেই।

কিন্তু তার একমাত্র দুর্বলতা ছিল সে পড়াশোনা করত না। সে গোটা বছর না পড়ে কাটিয়ে দিত আর পরীক্ষার আগে বই নিয়ে তার থেকেও পড়াশোনায় খারাপ কিছু ছেলেদেরকে নিয়ে বই পড়ে বোঝাত আর সঙ্গে সঙ্গে তারও পড়া হয়ে যেত। সে কিন্তু ঠিক পাস করে যেত এমনকী স্কলারশিপও বজায় রাখত।

অলোক খেলাধুলায় খুব ভালো ছিল। ফুটবলে লেফ্ট আউটে খেলত প্রথমদিকে পরে লেফ্ট ইনে খেলতে লেগেছিল। ক্রিকেটও সে ভালোই খেলত এমনকী তার ধ্যান-জ্ঞান-প্রেম খেলাতেই নিয়োজিত ছিল। আর আমি ছিলাম ঠিক উলটো খেলাধুলা আমার জন্য শাস্তিস্বরূপ। খেলাটা বাধ্যতামূলক ছিল বলে খেলতে যেতাম।

আমরা যখন ক্লাস সিক্সে একদিন অলোক আমাকে বলল, “গ্যারি সোবার্সের নাম শুনেছিস? ডন ব্র্যাডম্যানের নাম শুনেছিস?

ক্রিকেটে তাঁর গড় রান কত জানিস!" আমি তখন এসব কিছুই জানতাম না আমি তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম।

আমরা তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। সালটা উনিশ-শো তিয়াত্তর হবে। এক রোববার সন্ধেতে টেগোর হাউসের বাইরে 'ডি' আকারের লবিতে অলোক, আমি আর রাউত তিনজন বসেছিলাম। রবিবারে প্রেপ ক্লাস থাকে না আর রাত্রের ডিনার শুরু হতে দেরি ছিল। সুতরাং আমরা বাইরে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ তিনজনে খেয়াল করলাম অনেক দূরে ঠিক দিকচক্রবালে একটা উজ্জ্বল চাকতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এত সুন্দর দেখতে লাগছে কিন্তু সেটা কি? আমরা তিনজনেরই একই জিজ্ঞাসা। সেদিন আমাদের চোখে ছিল কৌতূহল আর অজানাকে জানার আনন্দ। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই উজ্জ্বল চাকতির দিকে এগোতে লাগলাম। আমরা যত এগোই সেই চাকতিটা তত পিছিয়ে যায়। শেষে আমরা এগোতে এগোতে স্কুলের মেইন গেটে পৌঁছে গিয়েছিলাম কিন্তু তখনও জিনিসটা যে কী সেটা বুঝতে পারিনি। আমি এক-দুইবার মিনমিন করে বলেছিলাম যে ওই চাকতিটা পূর্ণিমার চাঁদ মনে হয় কিন্তু সেই বলার মধ্যে দম ছিল না তারজন্য সেটা ধোপে টেকেনি। তারপর উপায়হীন হয়ে মনখারাপ করে আবার আমরা ফেরার রাস্তা ধরলাম। ঠিক সেই সময়েই এক সিনিয়র দাদার সঙ্গে দেখা। আমাদেরকে ধরে জেরা

করতে লাগল। আসল ঘটনা শুনে সেই দাদা সেদিন বলেছিল, "আগে কোনোদিন পূর্ণিমার চাঁদ দেখোনি! এটাকে ধরতে হলে চন্দ্রাভিযান করতে হবে। আজকে তোদের কী পড়িয়েছে স্যায়েন্সে?" অলোক জোর গলায় বলে উঠেছিল, "সলিড, লিকুইড, গ্যাস"। দাদাটা ঠাট্টার ছলে সেদিন বলেছিল অলোককে, "তুই সলিড", আমকে লিকুইড আর রাউতকে গ্যাস। সেই মজার কথা শুনে আমরা হাসতে হাসতে কুপোকাত। পরিবেশটা এক মূহুর্তে লঘু হয়ে গিয়েছিল। এখন মাঝে মাঝে ভাবি কথাটা যেন উভয় অর্থে ব্যবহার হয়েছিল সেদিন। তিনজনের মধ্যে আমি আজ একটাই মিল খুঁজে পায় সেটা হল আমরা তিনজনেই সুন্দরের পূজারী। সেদিন বোধহয় ছিল সৌন্দর্য খোঁজার প্রথম হাতেখড়ি। অপরিণত বয়সের এত সাধারণ একটা ঘটনা কিন্তু সেই খামখেয়ালিপনা পূর্ণিমার চাঁদ ধরতে যাওয়া ঘটনাটা স্মৃতিতে স্থায়ী একটা জায়গা করে নিয়েছে।

অলোকের এক কমন ডায়লগ ছিল, "উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।" তার এই উক্তিটা আমার মনে বিঁধে গিয়েছিল আর যেহেতু আমি মধ্যম প্রকৃতি ছাত্র তাই গোটা স্কুল জীবন এটা আমি মেনে চলেছিলাম। আর অলোক ছিল উত্তম প্রকৃতির তারজন্য সে অধমের সঙ্গে থেকেও ঠিক পাশ করে বেরিয়ে যেত। এই উক্তি আমাকে এত বেশি প্রভাবিত করেছিল যে পরবর্তীকালে আমার ছেলে-মেয়েদের

মানুষ করার সময় আমি এটা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। কতটা কাজে দিয়েছে জানি না কিন্তু ওরা এখনও মনে রেখেছে।

অলোক বাংলা গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসত। তার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে একবার পড়লে মনে রাখতে পারত। সে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতা খুব সহজেই আবৃত্তি করত আর আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। যেমন, "জাতির নামে বজ্জাতি সব, জাতের নামে খেলছে জুয়া..."। "ওই উঠেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই..."। এই কবিতাগুলো ওর মুখেই আমার প্রথম শোনা। সুকুমার রায়ের কবিতাগুলোও সুন্দর করে আবৃত্তি করত। সেই শুনে আমিও সুকুমার রায়ের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

অনেকদিন ক্লাসে দু-জনে পাশাপাশি বসে একটা গল্পের বই দু-জনে একসঙ্গে পড়তাম। বইয়ের পাতার একদিকে আমি আর অন্যদিকে অলোক। অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত দু-জনের মাঝে যে কে আগে শেষ করতে পারবে। আমরা তখন সবে কৈশোরে পৌঁছেছি প্রেম-ভালোবাসার কথাগুলো তখন সবে সুরসুরি দিচ্ছে। একলা মনের ভিতরেই কত ঝরনা বয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়েই অলোক একবার গরমের ছুটির পরে বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলল, "জানিস এবার বাড়িতে সাপ্তাহিক *অমৃত* পত্রিকাতে ধারাবাহিক একটা সুন্দর রোমান্টিক উপন্যাস পড়ছিলাম কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই চলে আসতে হল। ঠিক

ক্লাইমেক্সে ছেড়ে আসতে হল।” তারপর সে তার নিজস্ব স্টাইলে সেই উপন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিল। আর আমরা কয়েকজন শ্রোতা সেই কৈশোরের প্রাক্কালে সেই *সোনার হরিণ নেই* উপন্যাসের হাত ধরে ডুয়ার্সের চা বাগান হয়ে অসমের পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজে উপলব্ধি করলাম রোমান্টিসিজম কাকে বলে। আসলে অলোক খুব আড্ডাবাজ ছিল আর তার গল্প বলার নিপুণতা ছিল যেটা সবার থাকে না। আর যাদের এই পারদর্শিতা থাকে তারা অনেককে নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে পারে। অনেকে আবার এটাকে শিল্প পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ভালো কথক হয়ে যায়।

যাইহোক, সেই আংশিক রোমান্টিক উপন্যাস শুনে সেদিন আমরা সবাই বাকিটা পড়ার জন্য মরিয়া হয়ে সেই সাপ্তাহিক পত্রিকা খোঁজা শুরু করছিলাম। কয়েক কিস্তি জোগাড় করে পড়েছিলাম কিন্তু শেষ করা হয়নি। যেকোনো জিনিস অসম্পূর্ণ থাকলে সেটা বেশি আকর্ষণ করে আর বেশি করে মনে থাকে। মনোস্তত্ত্ববিদরা তাই বলে। সুতরাং সেই মিষ্টি নায়িকার শেষ পরিণতি জানার জন্য হ্যাপাটা থেকে গিয়েছিল। তারপর সেই গোটা উপন্যাস বইয়ের আকারে যেদিন আমার হাতে এসেছিল তখন আমি প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিয়েছি। পড়ে ভালো লেগেছিল ঠিকই কিন্তু সেই কৈশোরের ভালোলাগা ঘুরিয়ে পাইনি।

তার আর একটা গুণ ছিল সে খুব ভালো গান গাইতে পারত, খুব ভাল অভিনয়ও করতে পারত। যারজন্য প্রতিটা ফাংশানে তার গান গাওয়া ছিল বাঁধা। খোলা গলায় ভালোই গাইত সে। আর সে খুব সপ্রতিভ, লজ্জা, ভয় কম যারজন্য যেকোনো ফাংশানে সে স্টেজে উঠে গান গেয়ে দিতে পারত। এমনকী ইন্টার হাউস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ‘মারীচ সংবাদ’ নাটকে ফাটিয়ে অভিনয় করল সে, আর আমিও একটা ছোটো রোল করলাম। অলোক কিন্তু বলতে গেলে খেলাধুলায়, গানে, অভিনয়ে একেবারে অলরাউন্ডার ছিল। শুধু পড়াশোনাটা ইচ্ছাকৃতভাবে করত না। সেটা করলে কী হত বলা মুশকিল। হয়তো-বা তার জীবনরেখা অন্যরকম হত।

অলোকের চরিত্র সেই ছোটো থেকেই ‘বিন্দাস’ প্রকৃতির, অগোছালো, সাহসী, অ্যাডভেঞ্চারাস। হোস্টেলে জিনিসপত্রের কোনো হিসেব বা খেয়াল থাকত না। একবার ছুটির পর বাড়ি থেকে ছোটো ছোটো শিশিতে ছোটো ছোটো হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে এল। হয়তো-বা তার বাবা অসুখ-বিসুখ হলে কোনটা কখন খাবে বলে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অবসর সময়ে সে আমাদের সাঙ্গে ভাগ করে নকুল দানার মতো খেতে লাগল। মিষ্টি পেয়ে আমরাও হাত পেতে দিয়ে পেটে চালান করলাম। ওই অপরিণত বয়সে সেদিন সেটাই ছিল স্বর্গসুখ। এখন কিন্তু অকারণে সেই হোমিওপ্যাথি একটা গুলিও খেতে পারব না।

তার প্রথম বড়ো অ্যাডভেঞ্চার বোধহয় ক্লাস এইটে রাত্রে স্কুল থেকে পালিয়ে টাউনে সিনেমা দেখে ফিরে আসা। আর তারপর ধরা পড়ে সিনিয়রদের থেকে উত্তম-মধ্যম খাওয়া। তারপর সেই শারীরিক শাস্তি খাওয়ার পর বুক ফুলিয়ে হাসিমুখে আমাদেরকে সেই সিনেমার গল্প শোনানো। তখন সেটা ছিল সুপ্ত গর্বের বিষয় আর আমাদের চোখে সে তখন হিরো!

সে বরাবরই খেলাধুলাতে ভালো। সে খেলতে থাকল আর আমি দর্শক হয়ে দেখতাম আর শ্রোতা হয়ে খেলার গল্প শুনতাম। একটু ওপর ক্লাসে ওঠার পর আমাদের আড্ডার সময়সীমা বাড়তে থাকল। শনিবারের রাতগুলো আড্ডা দিতে দিতে ভোর হয়ে যেত। তারপর আলোকের হাত ধরেই শুরু হল স্কুল থেকে পালিয়ে টাউনে সিনেমা দেখা, রফি নাইট জলসা দেখা। যার গল্প আমি আগেই করেছি।

সে ছিল পাঁড় মোহনবাগানের সাপোর্টার আর আমি ছিলাম ইস্টবেঙ্গলের। প্রায়ই এই নিয়ে সে তর্ক জুড়ে দিত দুই সমর্থকদের মাঝে আর তার যুক্তিতর্কে সবাই কুপোকাত হয়ে যেত। সে ছিল রাজেশ খান্নার ফ্যান আর সেই নিয়ে অমিতাভ বচ্চনের ফ্যানদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত আর যথারীতি সে ওপরেই থাকত। এখন বুঝি এগুলো ছিল সব কৈশোরকালের 'টাইম পাসের' রাস্তা।

এমনি করেই ক্লাস ইলেভন অব্দি চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু ইলেভেনের পরেই বিপত্তি হল। অলোক যথারীতি না পড়েই পরীক্ষা দিল। আমি বলা সত্ত্বেও সে তার অভ্যাস বদলাল না। তারপর পরীক্ষার পর গরম বন্ধের পর যখন স্কুলে এলাম তখন খবর পেলাম যে অলোক ফেল করেছে যারজন্য সে আর আসবে না। এই খবর শুনে আমার মনে হল আমার যেন শরীরের একটা অংশ চলে গেল। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমরা যথারীতি টুয়েলভের ক্লাস শুরু করে দিলাম। কিছুদিন পরে অলোক তার বাবার সঙ্গে স্কুলে এল তার জিনিসপত্র নিয়ে বিদায় নেবার জন্য। আমরা সবাই তার জন্য হেডমাস্টারকে গিয়ে অনুরোধ করলাম কিছু করার জন্য। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন সদ্য জয়েন করা উইং কমান্ডার ট্যান্ডন স্যার। উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন তারপর তার মার্কশিট দেখে বুঝলেন যে সে কেমিস্ট্রিতে অনেক কম নম্বর পেয়ে ফেল করেছে। কেমিস্ট্রি টিচার লাহিড়ী স্যারকে ডেকে

পাঠালেন। লাহিড়ী স্যার বললেন, "অলোক তো প্র্যাকটিকাল খাতাই জমা দেয়নি সুতরাং নম্বর দেব কীভাবে?" প্রিন্সিপাল স্যার তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে কী বুঝলেন জানি না খালি বললেন প্র্যাকটিকাল খাতা লিখে এক্ষুণি জমা দিতে। সেই শুনে আমরা তার কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল খাতা নতুন করে নবরূপে লিখে জমা দিলাম আর অলোক আবার আমাদের সঙ্গে ক্লাস টুয়েলভে বসে ক্লাস করতে লাগল। পরে তার মুখ থেকে শুনেছিলাম যে প্রিন্সিপাল স্যার তারসঙ্গে চুক্তি করে শর্ত করে তাকে ভর্তি করেছিল। শর্তটা হচ্ছে তাকে NDA-তে পেতেই হবে না পেলে তাকে আবার স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। আমি সেটা শুনেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। এটা তো অসম্ভব এক কাজ। এন.ডি.এ.-তে এত কম ছেলে সুযোগ পায়, বাঘা বাঘা ছেলেরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসে আর আমাদের অলোক পড়াশোনা না করে কীভাবে এন.ডি.এ.-তে পাবে? অলোক কিন্তু সেই বিন্দাস আর আমি ওর জন্য টেনশনে পড়ে গেলাম। ততদিনে আমরাও সবাই নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। যথারীতি এন.ডি.এ.-র জন্য ইউ.পি.এস.সি. হল। আমি ফেল করলাম আর অলোক পাশ করে এস.এস.বি. ইন্টারভিউ দিতে গেল। সে ইন্টারভিউ পাশ করে ফিরে এল আর ঠিক সময়ে এন.ডি.এ.-তে জয়েন করল। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকে সেলাম করলাম। সে কিন্তু প্রিন্সিপালকে দেওয়া কথা রাখল। স্কুলের সম্মান উজ্জ্বল করল।

তারপর আমরাও যে যার ভবিষ্যতের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম আর অলোক বাস্তব থেকে সরে গিয়ে স্মৃতিতেই থেকে গেল। কিন্তু তার অনুপস্থিতি আমি খুব টের পেতে থাকলাম।

তারসঙ্গে আবার কাকতালীয় ভাবে দেখা হল দিল্লি পালাম এয়ারপোর্টে। সে তখন উইং কমান্ডার হয়ে ওখানে পোস্টিং। আর আমি ততদিনে ডাক্তার হয়েছি, সাইকিয়াট্রিস্ট হয়েছি, মেডিক্যাল কলেজে সদ্য যোগ দিয়ে বিলেত যাওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিতে দিল্লি গেছি। আবার সেই ঝটিকা সফরে অলোকের সঙ্গে দেখা আর তার সান্নিধ্য পাওয়া। আমি তার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকলাম তারপর বিদায় নিলাম। সে ভোরবেলায় আমাকে দিল্লি এয়ারপোর্টে ছেড়ে আসল। আমি ডিব্রুগড় ফিরে আসলাম খুশি মনে যে আবার অলোকের সাথে যোগাযোগ হল। তার কিন্তু একবিন্দু পরিবর্তন হয়নি সেই একই আছে। বিন্দাস অলোক।

আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম ঠিক তার অবসর নেওয়ার আগের বছর। সে তখন এলাহাবাদে একটা এয়ারফোর্স ইউনিটের হেড। সে তখন ‘এয়ার কমোডর’।

আমি সপরিবারে ওর ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে যে কী রাজকীয় ভাবে সে ছিল আর তার দৌলতে যেই আতিথেয়তা আমরা পেয়েছিলাম সে গল্প পরে হবে। ওখানে বেশ কিছুদিন তার অতিথি হয়ে তার সান্নিধ্যে কাটালাম আর উপলব্ধি করলাম সে যতই ওপরে উঠুক সে কিন্তু সেই আমাদের আগের অলোকই আছে।

আমাদের বন্ধু প্রদীপ বরুয়া

প্রত্যেক ক্লাসেই একজন করে বন্ধু থাকে যাকে সবাই মনে রাখে তার পড়াশোনা না করার জন্য আর সঙ্গে দুষ্টুমির জন্য। যথারীতি আমাদের সৈনিক স্কুলের ক্লাসেও একজন ছিল তার পদবী ছিল ‘বরুয়া’। ‘বরুয়া’ পদবী শুনে প্রথমদিকে আমরা তাকে অসমিয়া ভাবতাম। কিন্তু পরে সেই ভুলটা ভাঙল তার স্বীকারোক্তিতে। এখন আমি জানি বাঙালি বরুয়া পদবী মানেই চট্টগ্রামি বুদ্ধিষ্ট। তারা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

আমাদের সেই প্রদীপ বরুয়া প্রথম থেকেই ছিল বেশ এঁচোড়েপক্ক। তার চেহারাটা ছিল বেশ বড়োসড়ো, দেখলে আমাদের থেকে বয়সে একটু বড়োই লাগত। কিন্তু মনটা খুব সরল ছিল। সে যখন ক্লাস এইটে পড়ত তখনই তার গোঁফের রেখা স্পষ্ট আর কচি ধানক্ষেতের মতো খোঁচা খোঁচা দাড়ি স্পষ্ট দেখা যেত তার গালে। প্রদীপ বরুয়ার আবার অভ্যাস ছিল সবসময় দাড়িগুলোকে ধরে ধরে টেনে ছেঁড়া। সেটা হয়তো-বা তার অবচেতন মনের বয়স ঢাকার এক অদম্য প্রচেষ্টা ছিল। তার আবার অনেক মুদ্রাদোষ ছিল যেগুলো সে নিজের অজান্তে অভ্যাসবশত করে যেত যেমন কথা বলার সময় বাঁ-পা-টা জোরে

দুই তিনবার ঠুকত। প্রদীপ বরুয়া আবার খুব কুসংস্কারে বিশ্বাস করত আর সেই অভ্যাসগুলো নিয়ম করে পালন করত।

সে আমাদের ক্লাসে প্রথম হাতঘড়ি ব্যবহার করেছিল। সেটা ছিল 'সিকো' ঘড়ি, আর আমরা সেই সুন্দর ঘড়িটা আড়চোখে দেখতাম আর সুপ্ত হিংসে অনুভব করতাম। তখনকার দিনে ১৯৭৪ সনে সিকো হাতঘড়ি থাকা মানে বিরাট ব্যাপার, যার কাছে থাকত সে খুব গর্ব অনুভব করত। তবে তার কাছে ঘড়ি থাকার জন্য টাইম জিগ্যেস করতে করতে প্রদীপ বরুয়াকে অতিষ্ঠ করে দিতাম। আর সেও হাসিমুখে আমাদের আবদার মেটাত। সে পড়াশোনার থেকে খেলাধুলাতেই বেশি ভালো ছিল। ফুটবল খেলাতে সে স্টপারে খেলত। আর তার অন্য এক প্রতিভা ছিল যে সে 'আর্ম রেসলিঙে বা পাঞ্জা লড়াতে বেশ পটু ছিল। স্কুলে টিফিন টাইমে সে সবার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ত। আর একটা খেলা খেলত, হাতের তালুটা পারপেন্ডিকুলার ভাবে ডেস্কে রেখে আর একজন ওটাতে চাঁটা মারত অন্য কেউ। ওটাকে বলা হত, 'রস, কশ, সিঙ্গারা, বুলবুলি...' আমাদের হাতের তালু মার খেতে খেতে লাল হয়ে যেত আর হাট্টাকাট্টা প্রদীপ বরুয়া হাসিমুখে খেলে যেত।

তখনকার দিনে 'কুইজ কম্পিটিশন' ছিল খুব নতুন ব্যাপার। আমাদের একটা মোটা বই থাকত 'কুইজ'-এর ওপর পরীক্ষার জন্য। সেই সময় ক্লাসে কোনো কারণবশত কোনো

শিক্ষক না এলে তখন কুইজ প্রতিযোগিতা হওয়ার রেওয়াজ ছিল। যারজন্য ক্লাস সেভেন থেকে আমাদের কোন অফ পিরিয়ড থাকলে প্রদীপ বরুয়া বই দেখে দেখে কুইজ পরিচালনা করত ক্লাসের ভিতরেই। আমরা সকলে তিনটে সারিতে ডেস্কে বসতাম আর ওই তিনটে গ্রুপের মাঝে প্রতিযোগিতা হত। কোনো প্রাইজ ছিল না তবু আমরা স্থির হয়ে বসে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম।

প্রদীপ বরুয়া ছিল বাঙাল আর ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক যারজন্য প্রায় সে দুটো সমর্থককে ভাগ করে তর্ক জুড়ত ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। সেই কৈশোর বয়সে সেটাতেই শান্ত না থেকে সবসময় তর্ক করত দুটো দল বানিয়ে। এটা বোধহয় বয়সের স্বভাব যে সবসময় তর্ক বা যুদ্ধ করার জন্য দুটো বা তার অধিক দল তৈরি করে লড়তে হবে। প্রদীপ বরুয়া ছিল তখনকার দিনের সিনেমার নায়ক ধর্মেন্দর অন্ধ ভক্ত। আর নায়িকা হেমামালিনীর অন্ধ ভক্ত। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ধর্মেন্দর সব সিনেমা সে দেখে আসত আর তারপর চলত তার নখদর্পণে ময়নাতদন্ত। আর সেই সিনেমার গল্প বারম্বার শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যেত।

প্রদীপ বরুয়া সেই তর্কের খাতিরে ক্লাসে ধর্মেন্দর আর রাজেশ খান্নার ভক্তদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিত। আমরাও তর্ক করতাম এটা একটা খেলা ভেবে। বন্ধুরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে

যেত। একদিকে ধর্মেন্দর ফ্যান আর অন্যদিকে রাজেশ খান্নার ফ্যান। তর্ক হত কে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা মহাতারকা। ভালোই চলছিল সেই খেলা কিন্তু কোন ফাঁকে অমিতাভ বচ্চনের কিছু নতুন ফ্যান সেই তর্কের প্রতিযোগিতাতে ঢুকে সব বানচাল করে দিল!

আমরা যখন ক্লাস টেনে তখন 'শোলে' রিলিজ হল। প্রদীপ বরুয়ার বাড়ি ছিল কলকাতার কাছে শ্যামনগরে সুতরাং সে শোলে রিলিজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সেভেন্টি এম.এম. স্ক্রিনে স্টিটিরোফোনিক জ্যোতি সিনেমা হলে সে শোলে দেখে এল। তারপর? তারপর ছুটির পর স্কুল খোলার পর তার মুখ থেকে শোলের গল্প পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনতে থাকলাম। সেখানেই সে ক্ষান্ত থাকেনি, আমাদের প্রদীপ বরুয়া একটা নতুন ডায়েরিতে সেই 'শোলে'-র গল্প লিখতে লাগল। সিন-বাই-সিন সে ডায়লগ অনুযায়ী লিখে ফেলল যাতে ভুলে না যায়। আর আমরাও সেই ডায়েরির পাতা পড়তে পড়তে তাকে বাহবা দিতে থাকলাম।

একবার সেই প্রদীপ বরুয়া সন্ধেবেলার প্রেপে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। একজন ছেলে সন্ধেবেলার প্রেপ ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সচরাচর সেটা হতই। গোটাদিন খাটাখাটনির পর ওই কৈশোর বয়সে সন্ধেবেলায় পড়ার সময় ঘুম আসা খুবই স্বাভাবিক। সে কী করল, এক নতুন ফন্দি আঁটল ঘুমন্ত বন্ধুকে

জাগাবার জন্য। ক্লাসের সুইচ বোর্ডে একটা প্লাগ পয়েন্ট খোলা ছিল যেটাতে হাত দিলে কারেন্ট মারবে। প্রদীপ বরুয়া বদবুদ্ধি প্রয়োগ করে আমাদেরকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতে বললো। একদিকে আমরা হাতটা ছুঁয়ে রাখলাম ঘুমন্ত বন্ধুর শরীরে আর অন্যদিকে আমরা সবাই শেকল বানিয়ে প্রদীপ বরুয়া সেই খোলা প্লাগ পয়েন্টে তার আঙুল ছোঁয়াল। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশিতভাবে সবাই কারেন্টের ঝটকা খেলাম আর অন্যদিকে সেই ঘুমন্ত বন্ধু অচানক কারেন্ট খেয়ে জেগে উঠল। সেই বন্ধুর জেগে ওঠার প্রতিক্রিয়া দেখাটাই আমাদের আনন্দ দিত। সেই খেলাটা এখন ভাবলে গোটা শরীরে কাঁটা দেয়। কী বিপদজনক খেলা তখন আমরা খেলেছিলাম না বুঝে। Was it our blissful ignorance!

যখন আমরা ক্লাস নাইনে, পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পড়াশোনা করছি পাশ করার জন্য। তখন সেই প্রদীপ বরুয়া একদম না পড়ার জন্য বুঝে গিয়েছিল যে তার ফলাফল ভালো হবে না। সে প্রথম দিন ইংরেজি পরীক্ষাটা দিল। তারপর সেদিন রাত্রে খাওয়ার পর আমরা যখন প্রেপ ক্লাসে পড়তে ব্যস্ত তখন সেই বন্ধু প্রদীপ বরুয়া ক্লাসে এসে আমাদের থেকে উপযেচে বিদায় নিল। ‘শুভরাত্রি’ জানিয়ে চলে গেল। সবার কাছে গিয়ে গায়ে পড়ে খেজুরে আলাপ করে হাসতে হাসতে হোস্টেলে চলে গেল। কিন্তু সে হোস্টেলে গিয়ে লুকিয়ে

রাখা ঘুমের ওষুধ খেয়ে চিরস্থায়ী ঘুম দিয়ে দিল। সেদিন আবার নিজের বিছানায় না শুয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য একজনের বেডে শুয়ে পড়েছিল। সে জানত যার বিছানায় শুয়েছিল সে অনেক রাত করে ঘুমাতে আসত। মাঝরাতে যখন তার মুখ দিয়ে ফেনা বার হতে লাগল তখন তার রুমমেট সেটা দেখে বুঝতে পারল যে পরিস্থিতিতে কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। তৎক্ষনাৎ সে ওপর মহলে জানাল। ততক্ষণে প্রদীপ বরুয়া অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে তৎক্ষণাৎ পুরুলিয়া সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর বেশ কয়েকদিন যমে-মানুষে টানাটানি। শেষ অব্দি মানুষই জিতল আর প্রদীপ বরুয়া সুস্থ অবস্থায় আবার হোস্টেলে ফিরে এল। ততদিনে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত হলাম যে আমাদের বন্ধু সুস্থ হয়ে ফিরে এল।

কিন্তু আমাদের মতো কড়া হোস্টেলে কোথায় থেকে সে ঘুমের ওষুধ পেল? সেই রহস্য উদ্ধার হয়েছিল অনেক পরে। সেই ওষুধটার নাম ছিল ‘সেকেনাল সোডিয়াম’। পরে ডাক্তার হওয়ার পর বুঝতে পেরেছিলাম যে আসলে ওষুধটা কীসের। আসলে ওষুধের নামটা আমার অবচেতন মনে থেকে গিয়েছিল।

সেই প্রদীপ বরুয়া কিন্তু তারপর আর আমাদের সঙ্গে পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি। ক্লাস টেনের পরেই তাকে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। আমরাও হারালাম একজন হরিহর আত্মা সাথি। ক্লাস চলাকালীন ঘড়িতে টাইম দেখার হলে তার কথা মনে পড়ত। যদিও ততদিনে আমাদের ক্লাসের অন্য এক-দুইজন বন্ধুর হাতে ঘড়ি এসে গেছে।

বারো ক্লাস শেষ করার পর আমরা সবাই ক্যারামের গুটির মতো বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেলাম। সবাই নিজের নিজের কেরিয়ার গড়ার দিকে নজর দিলাম। অনেকদিন বিশেষ কোনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তারপর সবাই যখন থিতু হলাম, নতুন করে নতুনরূপে সবার সঙ্গে যোগাযোগ হতে লাগল তখন আবার সেই প্রদীপ বরুয়ার খবর করা হল। কিন্তু কেউ তার ঠিকানা দিতে পারল না। তার হদিস কেউ দিতে পারল না। তারপর অনেক বছর পর কানাঘুষোয় শোনা গেল যে প্রদীপ বরুয়া আর নেই। দুর্ঘটনাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

কথাটা আমি মন থেকে মানতে পারিনি। বিশ্বাস করতে অনেক সময় লেগেছিল।

প্রদীপ বরুয়ার কথা খুব মনে পড়ে। যেকোনো মানুষ তার নিজের অজান্তে তার কাজ কারবারে, ব্যবহারে কিছু কিছু ছাপ রেখে যায়। সেইগুলোই স্মৃতিতে থেকে যায়। যেমন এখনও 'রিস্ট ওয়াচ' দেখলে, হাত দিয়ে কাউকে সদ্য গজানো দাড়ি টান মেরে ওঠাতে দেখলে, পুরোনো নায়ক ধর্মেন্দর সিনেমা বা আলোচনা শুনলে, এমনকী 'শোলে' সিনেমার কথা উঠলেও সেই প্রদীপ বরুয়ার কথা খুব মনে পড়ে যায়।

‘দিল্লি চলো’—লঘু পাপে গুরু শাস্তি

আমরা যখন ১৯৭৭-এ স্কুলের ক্লাস নাইনে পড়ি তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ ঠিক করল যে শীতের ছুটিতে আমাদেরকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। সবাই খুব খুশি। ভ্রমণের জন্য যে যার পরিকল্পনা আঁটতে লাগল। আর মুষ্টিমেয় কিছু বন্ধু যারা আগে দিল্লি গিয়েছে তারা তাদের সীমিত জ্ঞানে ফুটানি মারতে লাগল। আমার মতো বেশিরভাগ বন্ধুদেরই দিল্লির জ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই যাওয়ার জন্য অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে আমরা দিন গুনছিলাম যে কবে দিল্লি যাব। তখন টাকা পয়সার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতাম না। আমাদের অভিভাবক ও ইনচার্জ হিসেবে সঙ্গে যাবেন আমাদের ক্লাস টিচার ও সঙ্গে আর-একজন টিচার।

যথারীতি আমাদের যেদিন শীতকালীন ছুটি আরম্ভ হবে ঠিক তারপর দিনই আমরা দিল্লির পথে রওনা হব ট্রেনে। ছুটি আরম্ভর দিন সব ছাত্ররা হোস্টেল খালি করে বাড়ি চলে গেল আর আমরা মুষ্টিমেয় দিল্লি পার্টি খালি হোস্টেলে মৌজ করতে লাগলাম। প্রথমদিন যেসব বন্ধুরা দিল্লি না গিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল কিছু বন্ধুবান্ধব তাদেরকে পুরুলিয়া স্টেশনে ‘সি-অফ’ করতে গেল। সেখানেই তো ঝামেলার সূত্রপাত। কলকাতা পার্টি

বিকালের ট্রেনে উঠবে এদিকে ট্রেন সিগন্যাল পেয়ে হুইসেল বাজিয়ে হেলতে দুলতে ছেড়ে দিয়েছে। আমাদেরই এক বন্ধু ওই চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে নীচু প্লাটফর্মে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভাগ্য ভালো যে ট্রেনের লাইনে ঢুকে যায়নি। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন সেই স্যার যেই স্যারের আমাদের সাথে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল।

সেদিন তো 'ফ্রি ইন্ডিয়া' সুতরাং এদিকে বিকেলে বেশ কয়েকজন মিলে টাউন চলে গেলাম সিনেমা দেখব বলে। মনের সুখে সিনেমা হলে ধর্মেন্দ্রর 'মা' সিনেমা দেখলাম। তখনকার দিনে হিন্দি সিনেমা জগতে ধর্মেন্দ্র এক নম্বর নায়ক। সেই সিনেমা দেখে বীরবিক্রমে রাত্রে হোস্টেলে ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম আমরা যাওয়ার পরেই সন্ধ্যায় হাউস মাস্টার এসে সবার 'রোল-কল' নিয়েছে আর যারা ছিল না তাদের নাম লিখে নিয়ে গেছে। সেই শুনেই আমাদের মাথায় বাজ পড়ল। কিন্তু নিজেকে নিজেই বোঝালাম যে ছুটির দিনে সবাই বাড়ি যাচ্ছে আর আমরা না হয় টাউন গিয়ে সিনেমা দেখে এলাম। সেটা কী-এমন বড়ো অপরাধ? আসলে সেই পূর্ণ কৈশোরে আমাদের তখন লেজ গজাচ্ছিল, বিদ্রোহী মনোভাব গা চাড়া দিচ্ছিল।

পরেরদিন সকালে নিজেদের বেডিং-বাক্স রেডি করে ব্রেকফাস্ট খেতে নামছি সামনে দেখি আমাদের বদরাগী হাউস মাস্টার মেইন দরজায় দাঁড়িয়ে এক-একজনকে ধরছে নাম

জিগ্যেস করছে আর বেধড়ক উত্তম-মধ্যম দিচ্ছে। তারমানে যারা যারা গতকাল বিনা পারমিশনে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল তাদেরকে ধরছে। উনি ছিলেন প্রচণ্ড ফর্সা এদিকে রেগে গিয়ে মুখটা লাল হয়ে অগ্নিবর্ষন হচ্ছে। একে উনি ইংলিশ টিচার আর মুখ দিয়ে তখন ইংরাজিতে গালিগালাজের বোমা ফুটছিল। ওঁকে দেখতে তখন খাঁটি রেগে যাওয়া সাহেব মনে হচ্ছিল।

আমরা লাইন করে মার খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের অবস্থা তখন বলি দেওয়ার আগে পাঁঠার মতো। হঠাৎ পিছন থেকে একজন সিনিয়র দাদা বলে দিল, “স্যারের কাছে গিয়ে কিছু জিগ্যেস করার আগেই প্রথমে সরি স্যার,সরি স্যার বলবি।” ব্যাস যেই আমার পালা এল আমি আউড়াতে লাগলাম, “সরি স্যার, সরি স্যার” একী, এ তো মন্ত্রের মতো কাজ করল! সাপুড়ে যেরকম সাপকে কাবু করে দেয়। এই ‘সরি স্যার, সরি স্যার’ শুনেই স্যার আর মারপিট করলেন না খালি একটু হালকা কানমলা দিয়ে ছেড়ে দিলেন। সে যাত্রা তো কোনোমতে রক্ষা হল কিন্তু আসল ঝড় তো তখনো আসেইনি। কে জানত যে এর পরেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল কালবৈশাখী।

ব্রেকফাস্ট টেবিলেই খবর পেলাম আমাদেরকে আর দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে না। ট্রিপ ক্যানসেল। গতকাল বদমায়শি করার জন্য এটা একটা ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন।

আমরা অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, মুচলেকা লিখে দিলাম যে এইরকম কাজ আমরা আর করব না। কিন্তু প্রিন্সিপালের আদেশ একই থাকল।

আমাদের কাছে সেদিন সেই আদেশ মনে হয়েছিল লঘু পাপে গুরু শাস্তি। আমাদের দিল্লি যাওয়ার পরিকল্পনা সব ভেস্তে গেল। সেটা স্বপ্ন হয়েই থাকল।

আমরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা হলাম ছুটি কাটাতে। কিন্তু অসময়ে বাড়ি যাওয়া মানেও তো আর-এক বিপদ। দিল্লি না যাওয়ার কারনটা বাড়িতে গিয়ে বলবটা কী?

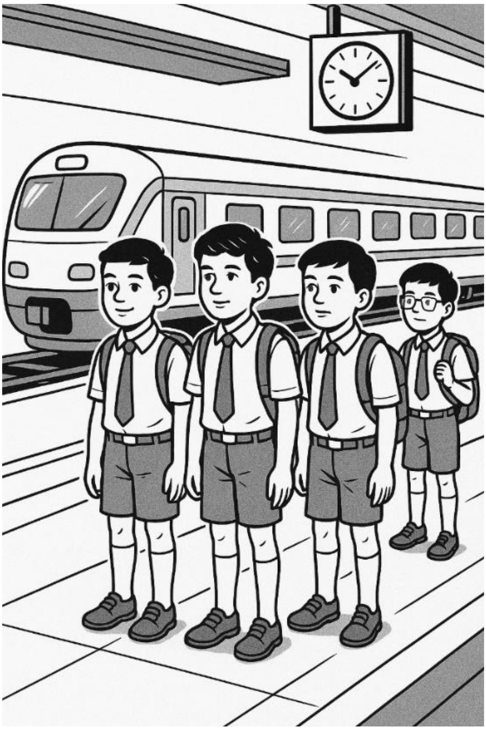

মৃত্যুর মুখোমুখি

আমাদের স্কুলে ছাব্বিশে জানুয়ারির দিল্লিতে গণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে যাওয়ার জন্য গুটিকয়েক এইট-নাইন-টেনের ছেলেকে সিলেক্ট করা হত ওইসময়ে দিল্লিতে যাওয়ার জন্য। ওখানে যাওয়ার জন্য তারাই সুযোগ পেত যারা প্যারেড ও কুচকাওয়াজে পারদর্শী হত। যথারীতি আমরা যখন ক্লাস এইটে তখন আমাদের ক্লাস থেকে চারজন সপ্রতিভ ছেলেকে বাছাই করে পাঠানো হল দিল্লিতে। একমাস আগের থেকে সেই গনতন্ত্র দিবসের মহড়া চলত। প্রথমে স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হত কলকাতায় সেখানে পূর্বাঞ্চলের সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে দিল্লি রওনা হত। দিল্লিতে গিয়ে রোজ তোড়জোড় চলত সেই ঠাণ্ডায়। কিন্তু সেই এক মাসের সফর সঙ্গে তাঁবু খাটিয়ে দিল্লির ঠাণ্ডায় থাকা ও কুচকাওয়াজের মহড়া সেই কৈশোর বয়সে এক আলাদা আনন্দ এনে দিত। পাওনা হিসেবে পাওয়া যেত একটা কালো ব্লেজার যার বুক পকেটের জায়গায় 'আর.ডি. ক্যাম্প দিল্লি' লেখা মনোগ্রামটা জ্বলজ্বল করে দৃষ্টি আকর্ষণ করত সবার। যে কেউ ওই ব্লেজার দেখলে বুঝে যেত সেই বান্দা দিল্লিতে ছাব্বিশে জানুয়ারি প্যারেডে গিয়ে দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতির সামনে কুচকাওয়াজ করেছে। সেটা তখনকার দিনে ভীষণ গর্বের ব্যাপার ছিল। আর আমরা যারা যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে যেতে পারিনি

তারা সেইসব বন্ধুরা ঘুরে এলে তাদের দিল্লি অভিযানের গল্প শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতাম।

আমাদের স্কুলে আবার প্রতি বছরে এন.সি.সি. থেকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হত। সেটাকে 'অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্প' বলা হত। আমরা যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আমাদের সুযোগ এল অসমের তেজপুরে অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য। যাওয়ায় আগে ঘরের গার্জেনের লিখিত অনুমতি নেওয়া হল যে ক্যাম্পে যদি কোন দুর্ঘটনা হয় তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। যথারীতি এসব আমাদের অগোচরে হয়ে যাবার পর আমরা ট্রেনে করে হাত-পা নেড়ে গলা ছেড়ে 'তাই রে নাই রে না' বলে তেজপুরের দিকে রওনা হলাম। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে প্রথমে আমরা হাওড়া গেলাম ওখান থেকে অসমগামী কামরূপ এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে প্রথমে বনগাঁইগাঁও গেলাম তারপরে মিটার গেজে ট্রেন পালটে রঙিয়া। গোটা রাস্তা খুব ফুর্তি করতে করতে এলাম। তখন তো আমরা ছাড়া গোরু!

রঙিয়া স্টেশনে অন্য ট্রেন ধরার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ঘণ্টা-পাঁচেক হবে। সেই ফাঁকে আমরা স্টেশনের বাইরে গিয়ে একটা সাধারণ হোটেলে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, নিরামিষ তরকারি, ভাজা আর অসমের গন্ধ-লেবু দিয়ে খেয়েছিলাম। মনে হল যেন অমৃত খাচ্ছি। তখন কী আর জানতাম

যে আমার ভবিষ্যৎ এই অসম রাজ্যেই লেখা আছে। সেই আতপ চালের ভাত গন্ধ লেবু দিয়ে শেষ বয়স অব্দি খেতে হবে!

সেইদিন খাওয়া-দাওয়া করে একটা সিনেমা হলের বাইরে খানিকক্ষণ কাটিয়েছিলাম। সেই সিনেমা হলের বাইরে টিকিট কাউন্টারে বাংলা লিপিতে অসমিয়া লেখা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল 'সারি পাতি টিকট লবো' তার সঠিক মানে উদ্ধার করার জন্য আমরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করলাম। তারপর একজন স্থানীয় লোককে জিগ্যেস করে বুঝলাম যে তার অর্থ, "সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট নেবেন"।

রঙিয়া স্টেশন থেকে আবার মিটার গেজে অন্য ট্রেন ধরে রঙাপাড়াতে গিয়ে নামলাম বিধ্বস্ত অবস্থায়। রঙাপাড়াই আসলে তেজপুর স্টেশন। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল অসমের তেজপুরে বিকালে পৌঁছোলাম। অস্থায়ীভাবে আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল একটা স্কুল বিল্ডিঙে। অস্থায়ী এইজন্যই বলছি কেন-না পরে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শহর থেকে দূরে একটা ফাঁকা মাঠে যেখানে আমাদের টেন্ট খাটিয়ে থাকতে হয়েছিল ক্যাম্পের নিয়মাবলী অনুসারে। সাধারণত ক্যাম্পে গেলে থাকার ব্যবস্থা টেন্টেই হয়। টেন্টে থাকার অভিজ্ঞতাই আলাদা।

পরেরদিন আমরা সেই স্কুল বিল্ডিঙ থেকেই ক্যাম্পের জায়গায় গেলাম বাসে করে। সারাদিন ধরে ক্যাম্পের ভূমিকা পড়ানো ও শেখানো হল। বিকেলে যখন বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এলাম

তখন সূর্য্য ডুবে অন্ধকার নামছে। সবাই গোটাদিনের ধকলের পরে স্নান করতে লাগল টিউবওয়েলে আর কিছু ছেলে সবান নিয়ে সোজা চলে গেল পাশের পুকুরে স্নান করতে। পুকুরটা খুব লম্বা ছিল আর ওই গরম দিনেও জলে টইটুম্বুর হয়েছিল। জলটা ছিল খুব ঘন আর ভারী। পরে জেনেছিলাম ওই পুকুরটাকে স্থানীয় লোকেরা ‘পদমপুকুর’ বলে যার অর্থ পদ্মপুকুর। এক এক করে কয়েকজন গিয়ে স্নান করে ফিরে আসলো কিন্তু একটা গ্রুপের চার পাঁচজনের মধ্যে একজন স্নান করতে গিয়ে ডুব মেরে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। ততক্ষনে আমি ওই পুকুরপারে পৌঁছেছি স্নান করার জন্য। সবাই ওর নাম ধরে ডাকছে এইভেবে যে সে নিশ্চয় দুষ্টুমি করে লুকিয়ে আছে কোথাও। কিন্তু তবুও তার সাড়া পাওয়া গেল না। আমি গ্রামের ছেলে পুকুরে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সাঁতার কাটার অভ্যাস আছে তাই সাঁতারু হিসেবে একটা সুপ্ত গর্ব অনুভব করতাম। সুতরাং পুকুর পারে এসব শুনে আমি পুকুরে নেমে সাঁতার কেটে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত গোরু খোঁজা খুঁজে নিরাশ হয়ে উলটোপারে উঠে এলাম। উপায়হীন হয়ে যখন আবার সেই থাকার জায়গায় স্কুল বিল্ডিঙে উঠলাম তখনও সেই বন্ধুকে পাওয়া যায়নি। কানাঘুষোয় শুনলাম সে পুকুরে ডুব জলে স্নান করতে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে আদৌ সাঁতার জানত না। তার বাড়ি ছিল কলকাতার দমদমে। আস্তে আস্তে কথাটা আমাদের টিচার ইনচার্জকে জানানো হল। উনি আবার উচ্চ কর্তৃপক্ষকে জানালেন। ততক্ষণে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে, সেই বন্ধু তখনও

নিখোঁজ। আমরা নিজেদের রুমে বসে জল্পনা-কল্পনা করছি যে কী হতে পারে কেসটা। এতক্ষণ আমাদের বয়সী কোনো ছেলে কী সাঁতার কেটে জলে থাকতে পারে? ওই অপরিপক্ক কম বয়সে মনে অন্য খারাপ কিছু আসতে চাই না। তারপর ফায়ার ব্রিগেড ডাকা হল, তারা এসে সার্চ লাইট ফেলে অনেক কষ্টে ডুবন্ত জলের পাঁকে আটকে থাকা তার শ্বাসহীন ফুলে থাকা শরীরটাকে ওঠাল। তারপর? তারপর তার শরীরটাকে স্থানীয় হাসপাতালে পোস্টমর্টেম করতে নিয়ে গেল সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু গেল। আমাদেরকে জানানো হল তাকে হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই বন্ধুর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। সকালে খবর পেলাম আমাদের সঙ্গের বন্ধু, আমাদেরই বয়সী তরতাজা বন্ধুটা আর নেই। সেই শুনে ভীষণভাবে শক পেলাম। তারসঙ্গে পুরোনো কথা মনে পড়তে লাগল। নিয়ম মেনে ছোট্ট একটা শোকসভা হল। বন্ধুর বাড়িতে কলকাতায় টেলিফোনে খবর দেওয়া হল। তখন বুঝতে পারলাম কেন ক্যাম্পে যাওয়ার আগে বাড়ির গার্জেনের থেকে সই নিয়ে সম্মতি নেওয়া হয়েছিল যে ক্যাম্পে কোনো অঘটন ঘটলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে সেই বন্ধুর বাড়িতে খবর দেওয়ার পর তার বাবা বলেছিলেন, “যা হয়েছে সেই ঘটনা আর

যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। আমাদের মতো অবস্থা যাতে আর কোন বাবা-মায়ের না হয়।”

আমাদেরকে পরের দিন অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। এক বিরাট মাঠের মধ্যে টেন্ট খাটিয়ে আমরা আমাদের ক্যাম্প জীবন শুরু করেছিলাম শুধু একজনকে আগের জায়গায় বিদায় দিয়ে।

যেহেতু সেই বন্ধুর মৃত্যু ছিল অস্বাভাবিক এক দুর্ঘটনায় সেহেতু এন.সি.সি. ক্যাম্পের নিয়ম অনুযায়ী মিলিটারি পদ্ধতিতে আর্মি অফিসার দ্বারা এনকোয়ারি কমিটি গঠন করে এনকোয়ারি হল। যারা যারা সেদিন পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল তাদের কে এক এক করে ডেকে জবানবন্দি নিয়ে তদন্ত হল। আমি যেহেতু সেদিন পুকুরে গিয়েছিলাম সুতরাং আমাকেও ডাকা হয়েছিল। আমি যা দেখেছি বা করেছিলাম তার বৃত্তান্ত দিয়ে জবানবন্দি

দিলাম। আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন এক পাঞ্জাবি সর্দার অফিসার। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওঁর মুখে স্পষ্ট বাংলা শুনে আর আমিও তখন হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিত মনে সব উত্তর দিয়েছিলাম।

জীবন কখনো থেমে থাকে না। সেদিন বুঝেছিলাম "The show must go on" এটার প্রকৃত অর্থ কী। পরের দিন থেকেই আমরা আবার ক্যাম্পের রুটিন মতে চলতে লাগলাম। সকাল থেকে রাত্রি অব্দি ব্যস্ততা। বন্ধুর অকাল মৃত্যুর শোকের ওপর প্রলেপ পড়ে গেল। শোকটা যেন প্রকাশ পেল না। যেকোনো শোক যদি ঠিক সময়ে প্রকাশ না পায় তাহলে ভবিষ্যতে অন্য রূপ ধারণ করে। শোকটা অবচেতন মনে চাপা পড়ে গেল।

ক্যাম্পের দিনগুলো গতানুগতিকভাবে চলতে থাকল। ক্যাম্পফায়ার প্রোগ্রামে গান বাজনাও হল 'বড়াখানা' (Special dinner)ও হল শেষের দিন। তারপর ফেরার প্রস্তুতি। আমরা আবার যে যার পাত্তারি গুটিয়ে একই পথে ট্রেন যাত্রা শুরু করলাম। সবাই যে যার ঘরে ফিরে এলাম কিন্তু একজনকে রেখে এলাম। সে আর ফিরবে না সে স্মৃতিতেই থেকে যাবে।

তারপর অনেকবার বিভিন্ন কারণে তেজপুরে গিয়েছি আর যতবার গিয়েছি প্রতিবার ওই বিভীষিকাময় পুকুরটাকে খুঁজেছি। এতদিনে অনেক জনবসতি হয়েছে, তেজপুর শহরের লোকসংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। সেই পদমপুকুরের আশপাশে সব বদলে গেছে কিন্তু পদমপুকুর সেই একই থেকে গেছে। প্রতিবার আমি সেই

পদমপুকুরে যাই তীর্থ দর্শনের মতো। এখানকার স্থানীয় লোকজনদের মতে এই পদমপুকুর খুব বিপদজনক। এই পুকুরে প্রতি বছর একজন জীবন বলিদান দেয়। আমি দেখি জায়গাটা তারপর বিষণ্ন মনে ফিরে আসি আর সেই উনিশ-শো সাত্তাত্তরের ক্যাম্পের কৈশোরের স্মৃতি মনে বদহজমের মতো ঢেকুর মারে। সেই বন্ধুর অবয়ব স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই স্মৃতি তো ভোলার নয়। হয়তো-বা এই unresolved শোক গোটা জীবন আমাদের বইতে হবে জাগরণে, শয়নে বা স্বপনে।

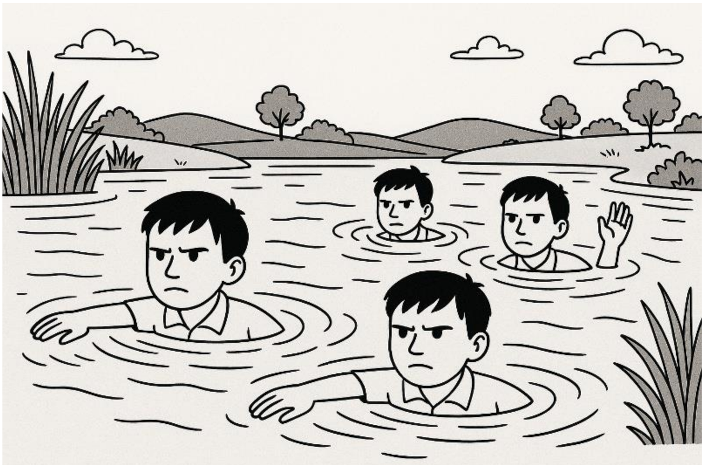

স্কুল পালিয়ে রফি নাইট

আমরা তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ি, সনটা ১৯৭৯। সবে তখন নাকের নীচে গোঁফের রোঁয়া উঠছে, কৈশোরের শেষ প্রান্তে এসেও কৈশোর সুলভ বদমায়শিগুলো নিষ্ক্রিয় হয়নি। প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি না মানাটা এক ধরনের বিদ্রোহ। সেটা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন সেই স্বভাব অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। আর যদি সেই স্বভাব সাময়িকভাবে থেকে আবার মূলস্রোতে ফিরে যায় তখন সেই ঘটনাগুলো স্মৃতিতে জলছবি হয়ে থেকে যায়। পরবর্তীকালে ঘটনাগুলো মনে পড়ল স্মৃতিরোমন্থন খুব আনন্দ দেয়।

হঠাৎ করে হোস্টেলে খবর পেলাম যে আগামী শনিবার টাউনে মহম্মদ রফি সাহেব গান গাইতে আসবেন। সোজা ভাষায় 'রফি নাইট'। সেই খবর শুনেই আমার মতো কয়েকজনের মাথার পোকা নড়ে উঠল। স্কুল থেকে পালিয়ে টাউনে গিয়ে রাত্রে 'রফি নাইট' দেখতে হবে। আমাদের স্কুল, টাউন থেকে অনেকটা দূরে, পাঁচ কিলোমিটার হবে। দিনেরবেলায় বাস চলাচল করলেও রাত্রে টাউন যেতে হলে হেঁটেই যেতে হত। নির্দিষ্ট কোন জায়গায় 'রফি নাইট' হবে সেটাও জানতাম না। টিকিটের কোনো বালাই নেই, টিকিটের কত দাম তাও জানি না। আর তার থেকেও বড়ো কথা

টিকিট কেনার পয়সাও সঙ্গে নেই। কিন্তু সঙ্গে ছিল অদম্য উৎসাহ, সাহস আর ওই যে আগে যেটা বললাম নিয়ম ভাঙার বিদ্রোহীভাব।

নির্দিষ্ট দিনে রাতের খাওয়া সেরে আমরা কয়েকজন রেডি যাবার জন্য। এসব নিয়ম ভাঙার বিদ্রোহীতার আমার হরিহর আত্মা সঙ্গী অলোক যথারীতি রেডি।

আমি কাঁচুমাচু মুখে অলোককে জিগ্যেস করলাম, “আমাদের তো টিকিট নেই, এত দূর যাওয়ার পর যদি সেই রফি সাহেবের দর্শনই না পেলাম তবে এত বড়ো ঝুঁকি নিয়ে রাত্রে গিয়ে লাভটাই বা কী?” অলোক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, “রাত্রি বারোটার পর গেট খুলে দেবে তখন আর কোনো টিকিটের দরকার পড়বে না।” এতবড়ো আশার বাণী শুনে আমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে হোস্টেলের রুমে নিজের বিছানাটাকে পরিপাটি করে সাজিয়ে, মশারি টাঙিয়ে দিলাম যাতে বাইরে থেকে বিছানাটা দেখলে মনে হয় যে হ্যাঁ ছেলেটা শুয়ে আছে।

রাতের অন্ধকারে পি.টি. শু পরে মাঠ পেড়িয়ে স্কুলের বাউন্ডারি পার হলাম। তখনকার দিনে বাউন্ডারি তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা থাকত আর মাঝে মাঝে থাকত লম্বা সিমেন্টের পিলার। একটা জায়গায় তারকাঁটা ছেঁড়া ছিল যেখান দিয়ে অনায়াসে আমাদের ছোট্ট শরীর গলে যেত। আর তার থেকেও বড়ো কথা আমরা কয়েকজন ওই জায়গাটা চিনতাম যার ফলে চৌকিদারের

অজান্তে আমরা ওই খালি জায়গা দিয়ে সুন্দর আসা-যাওয়া করতে পারতাম।

যতদূর মনে আছে সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। আমরা বাউন্ডারি পেরিয়ে খালি মাঠের গর্ত ডিঙিয়ে দৌড়াচ্ছি আর থেকে থেকে হাঁটছি। অনেকটা যাওয়ার পরে মেইন রাস্তা পাওয়া যাবে। আমাদের সাদা শার্ট প্যান্ট পূর্ণিমার আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে পাঁচমূর্তি চোরের মতো এগিয়ে যাচ্ছে। যদি কেউ দেখত তাহলে নিশ্চয় ভাবত হয় আমরা চোর তা নাহলে ভূত।

মেইন রাস্তায় যখন পৌঁছালাম তখন দূর থেকে গান ভেসে আসছে। রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে রফি সাহেবের গানের আওয়াজ যখন কানে এল তখন বুঝলাম যে স্টেজে রফি সাহেব উঠে গান শুরু করেছেন। সেই শুনে আমাদের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমরা আবার তাড়াহুড়ো করে গান লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। গান লক্ষ্য করেই তো যেতে হবে কেন-না কোথায় হচ্ছে সেটাই তো জানা ছিল না!

সেই বছর ‘হাম কিসিসে কম নেহি’ সিনেমার মহঃ রফি সাহেবের ‘ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা...’ গানটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম রফি সাহেব প্রথমেই এই গানটা গাইবেন। আমরা খুব আশা নিয়ে যাচ্ছিলাম চাক্ষুষ ওই গানটা শুনব গায়কের গলায়।

একটা সময় নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছালাম। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ঘেরা স্টেডিয়াম আর কানে ভেসে আসছিল গান আর আমরা তখন আনন্দে আটখানা যেন অলিম্পিকে মেডেল জিতে নিয়েছি। এদিকে রাত হয়েছে, পূর্ণিমার আলোয় আমরা এবার একসঙ্গে পাঁচজন গন্তব্যস্থানের দিকে এগোচ্ছি হঠাৎ সামনে দেখতে পেলাম আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার, প্রিন্সিপাল সপরিবারে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে। তারমানে তাঁরাও রফি নাইট দেখতে এসেছিল এখন রাত হয়েছে বলে বার হয়ে এসে স্কুলের কোয়ার্টারে ফিরবে বলে গাড়ি পার্কিঙে যাচ্ছিল।

সামনে ভূত দেখলেও বোধহয় আমরা এতটা ভয় পেতাম না যতটা প্রিন্সিপালকে দেখে পেয়েছিলাম। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষনাৎ রিফ্লেক্সে একসঙ্গে আমরা রাস্তার পাশে ছিটকে সরে গেলাম। সেখানে একটা ঘরের খোলা বারান্দাতে কয়েকটা কাঠের খাটিয়া পাতা ছিল আর কিছু শ্রমিক শ্রেণির লোক খাটিয়াতে ঘুমোচ্ছিল। বেচারা লোকগুলো হয়তো-বা সারাদিন খেটেখুটে ঘুমোচ্ছিল। আমরা ভয়ে লুকাবার জন্য ওদের খাটিয়াগুলোর নীচে যেই ঢুকেছি শ্রমিকগুলোর ঘুম ভেঙে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা ভেবছিল নিশ্চয়ই কোনো ছিঁচকে চোর ঢুকেছে। কোনোমতে ওদেরকে ধমক দিয়ে থামালাম। আমাদের মানসিকতা তখন ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’। কিছুক্ষণ চুপ করে

চোরের মতো লুকিয়ে আবার যখন বীরদর্পে বার হলাম ততক্ষনে আমাদের প্রিন্সিপাল মহাশয় চলে গেছেন চোখের বাইরে।

আর পায় কে। ফাংশান হওয়া জায়গাটার কাছে পৌঁছে দেখি অলকের কথা মতো গেট খুলে দিয়েছে। আমরা পড়িমরি করে ঢুকে ততক্ষণে সোজা স্টেজের কাছাকাছি পৌঁছে গায়কের কাণ্ডকারখানা দেখতে ব্যস্ত। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি রফি সাহেব নিজে হারমোনিয়াম নিয়ে মনের সুখে গান গাইছেন আর ঊষা খান্না পাশে দাঁড়িয়ে দ্বৈত সংগীতে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। তখনকার দিনে না ছিল টেলিভিশন না ছিল ইন্টারনেটে দেখার সুযোগ সুতরাং সামনাসামনি নামী গায়কের গান শোনা মানে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। উনি এক-একটা গান নিজস্ব স্টাইলে গাইছেন আর আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করছি।

সব কিছুরই শেষ আছে সুতরাং একটা সময় ফাংশন শেষ হল। লোকজন সব স্রোতের মতো বার হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল। আমাদেরও ফিরতে হবে কিন্তু তাড়াও নেই আর ফেরার ইচ্ছেও নেই। মঞ্চের কাছেই আমরা যখন এলোপাথাড়ি ঘুরছি তখন হঠাৎ দেখি আমাদের স্কুলের আমাদের মতোই কিছু সিনিয়র ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন আমরা সবাই এক গোয়ালের গোরু সুতরাং কেউ কারোর নামে নালিশ করবে না।

এবার ঘরে ফেরার পালা থুড়ি স্কুলের হোস্টেলে ফেরার পালা। আবার সেই একই রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ফিরে আসা। যখন তারকাঁটা পেরিয়ে স্কুলে ঢুকছি তখন ভোরের আলো ফুটছে। সকালবেলার পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ, তারা তাদের দিন শুরু করবে। ঠিক যেন 'তোমার হল শুরু আমার হল সারা...'।

‘স্কুলের অ্যানুয়াল ডে’

আমাদের মেডিক্যাল কলেজের আজকে থেকে ‘কলেজ উইক’ শুরু হল। এটা এখন টানা সাতদিন চলবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস বন্ধ কিন্তু আমাদের আউটডোর ও বিভিন্ন রোগী পরিষেবা যথারীতি চালু থাকবে। এখন ইন্টারক্লাস বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা চালু থাকবে আর গান-বাজনা-নাটক প্রতিযোগিতা চলবে। আমাকে আবার কয়েকটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিচারকের ভূমিকা নিতে হবে। আমার মনে পড়ে গেল সেই সুদূর পঞ্চাশ বছর আগে সৈনিক স্কুলের বার্ষিক দিবস (‘অ্যানুয়াল ডে’) অনুষ্ঠান।

যতদূর মনে পড়ে স্কুলে এই অনুষ্ঠানটা হত ঠিক মার্চ মাসে। সেই গোটা মাসটা সবাই ব্যাপকভাবে ব্যস্ত থাকত নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমে। রোজ ক্লাসের পরেই আরম্ভ হয়ে যেত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। আউটডোর ও ইনডোর গেমস। সবকিছু তিনটে পর্যায়ে ভাগ হত ক্লাস অনুযায়ী। জুনিয়র, মিডল আর সিনিয়র গ্রুপ। আর প্রতিযোগিতা হত চারটে হাউসের মধ্যে। আগেও বলেছি সেই চারটে হাউস হল প্যাটেল, টেগোর, তিলক ও চিত্তরঞ্জন হাউস।

আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর ছিল ‘ম্যারাথন রেস’। সেই প্রতিযোগিতায় আবার সবাই ভাগ নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

সক্কাল সক্কাল এক নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে স্কুলের গোটা ক্যাম্পাসের পরিধি দৌড়াতে হবে তারপর ঘুরে আসতে হবে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানে। গোটা রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি ছিল, মাঝখানে আবার মেইন রাঁচি রোড পেতাম। সেটা পার হয়ে লাকদা গ্রামের কাছাকাছি এসে স্কুলের বাউন্ডারি শেষ হত। সেখান দিয়ে ঢুকে আবার স্কুলের চত্বরে। ততক্ষণে আমার মতো দুর্বল দৌড়বিদদের অবস্থা কাহিল। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। অনেকে আবার মুখে একটা রুমাল গুঁজে ম্যারাথন দৌড়াত ভাবত তাহলে শ্বাসকষ্ট কম হবে। তারপর যেই শেষ জায়গাতে পৌঁছালাম তখন আমাদের হাতে একটা স্লিপ ধরিয়ে দেওয়া হত যেটাতে লেখা থাকত দৌড় শেষ করার রাঙ্কিং। যথারীতি আমার রাঙ্কিং শেষ পর্যায়ে ভালোই থাকত! এতবড়ো যুদ্ধ জয় করেও তো শান্তি নেই। তারপর আবার শুরু হয়ে যেত রুটিন ক্লাস, মিল্ক ব্রেক, ছুটি।

ফাইনাল ডে-তে সকালবেলায় মার্চপাস্ট হত মেইন ফিল্ডে। সেদিনকার ড্রেস থাকত সাদা প্যান্ট আর সঙ্গে নিজের হাউসের রঙের টি-শার্ট। চারটে হাউসের রঙ আলাদা আলাদা ছিল যারজন্য দেখলেই বোঝা যেত কে কোন হাউসের। প্যাটেল হাউস ছিল লাল/মেরুন, টেগোর ছিল সবুজ, তিলক হাউস নীল আর চিত্তরঞ্জন হাউসের ছিল ছাই/গ্রে রঙ। পরপর চারটে হাউস মার্চপাস্ট করত। সামনে হাউস ক্যাপ্টেন লম্বা পোলে একটা

পতাকা নিয়ে লিডার হিসেবে যেত। সবাই ব্রাস ব্যান্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে প্রধান মঞ্চে গিয়ে ডাইনে দেখ করত যেখানে সেদিনকার মুখ্য অতিথি মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্যালুট মারতেন। তারপর সেই অলিম্পিকের কায়দায় একজন বেস্ট অ্যাথলেট মশাল থেকে অলিম্পিক অগ্নিশিখায় আগুন জ্বালাত। সেই অগ্নিশিখা শেষ অব্দি জ্বলত যতক্ষণ সেইদিন স্পোর্টস চলত।

তারপর কার্যক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন স্পোর্টস আরম্ভ হয়ে যেত। এক-শো মিটার, চার-শো মিটার, পনেরো-শো মিটার দৌড়, রিলে রেস, লং জাম্প, ট্রিপল জাম্প, হাই জাম্প, পোল ভল্ট সব একের-পর-এক ফাইনাল প্রতিযোগিতা হত।

দুপুরে যথারীতি লাঞ্চের পর আবার শুরু হত বিভিন্ন কার্যসূচি। দুপুরে শুরু হত 'মাস পি.টি.'। সেটাতে ক্লাস নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করতে হত। এই 'মাস পি.টি.' সফল করার জন্য আমাদের গেম টিচার মিস্টার জি বি সিং ভীষণ কষ্ট করতেন। রোজ সকাল-বিকাল সব ছাত্রদেরকে নিয়ে কঠোর অনুশীলন করানো ছিল ওঁর দায়িত্বে। আমাদের মেইন অ্যাথেলেটিক্স ফিল্ডটা ছিল একটা চতুর্ভুজ আকারের। সেখানে কোনো ঘাস ছিল না আর মেইন রাস্তার দিকে প্যান্ডেল করা হত আমাদের টিচার আর নিমন্ত্রিত অতিথিরা দর্শকরা বসে ফাইনাল ডে-তে গোটা অনুষ্টানটা উপভোগ করত। সেদিন আবার

‘পেরেন্টস ডে’ থাকত যারজন্য অনেকের মা-বাবা সেদিন ওই দর্শক আসনে বসে থাকতেন।

সেই বসার প্যান্ডেলের উত্তর দিকে ছিল কিছু সারিসারি ইউক্যালিপটাস জাতীয় কিছু গাছ। সেইখানে বানানো হত অস্থায়ী চারটে টেন্ট হাউস যেখানে নিজের হাউস অনুযায়ী প্রতিযোগিরা বিশ্রাম নিতে পারত। তার পিছন দিকেই হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তা। আর প্যান্ডেলের দক্ষিণ দিকটার শেষপ্রান্তে ঢালু উতরাই যেখানে ম্যানগ্রোভ শুরু হয়েছে। আর ঠিক প্যান্ডেলের উলটো দিকটা ছিল অনেকটা নীচু উতরাই সেখানে ঘাস ও জংলি কিছু গাছ। সামনের দিক থেকে এই ঢালু জায়গাটায় কী হচ্ছে কিছু দেখা যায় না। সেটার জন্যই রাত্রে স্কুল থেকে পালাতে হলে এই ঢালু রাস্তাটাই ছিল সবার পছন্দ।

যাইহোক ফাইনাল ডে-তে যখন ‘মাস পি.টি.’ হত আমরা সবাই ওই মঞ্চের উলটোদিকের ঢালু জায়গা থেকে চড়াই হয়ে উঠে আসতাম। সবাই পরে থাকত সাদা হাফপ্যান্ট, সাদা হাতকাটা গেঞ্জি, সাদা কাপড়ের জুতো (কেডস) মোজা। আর সুন্দর রাজকীয় ড্রেস পরে বাজনা বাজাত পেশাগত (প্রফেশনাল) ব্যান্ড গ্রুপ। ছাত্ররা যখন সেই বাজনার তালে তালে ওপরে উঠে আসত তখন সেই দৃশ্য ছিল দেখার মতো। তারপর কুড়ি-ত্রিশ মিনিট সেই ছন্দের সঙ্গে সমলয়ে বিভিন্ন পি.টি.-র কসরত দর্শকরা পলকহীন অভিভূত হয়ে দেখত।

তারপরের অনুষ্ঠান প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। আর আমরা হাউস অনুযায়ী গ্রুপে লাইন করে দাঁড়িয়ে প্রাইজ দেওয়া দেখতাম আর হাততালি দিতাম। আসল আকর্ষণ ছিল একক অ্যাথেলেটিক্সে কে চ্যাম্পিয়ন হবে। আর শেষ অব্দি কোন হাউস সবচেয়ে বেশি প্রাইজ পেল ও কোন হাউস চ্যাম্পিয়ন হল সেটাই ছিল আমাদের শেষ আকর্ষণ।

যেটা বলা হয়নি সেটা হল সেই পেশাদারী ব্যান্ডের গ্রুপটা বোধহয় কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আসত। আর আমরা গুটিকয়েক বন্ধুরা ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে সন্ধেবেলায় তাদের ডেরায় গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক শুনে আসতাম তাদের বিভিন্ন যন্ত্র থেকে। এখনো মনে আছে তাদের বাজানো

‘আরাবিয়ান নাইট’, ‘ট্যাঙ্গো’ ইত্যাদি। ওই কৈশোর বয়সে ওইসব মিউজিক মনের মধ্যে ঝংকার তুলে দিত।

রাত্রে ডিনারের পর যখন স্কুল ক্যাপ্টেন ঘোষণা করত যে পরেরদিন ছুটি তখন সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠত। আজকের দিনে হলে আমরা নিশ্চয় বলে উঠতাম ‘ওয়াউ’!

স্কুলের নিষিদ্ধ জায়গাগুলো

আমাদের সৈনিক স্কুলে ক্যাম্পাসের কিছু জায়গা ছিল যেগুলো 'নিষিদ্ধ এলাকা' যেখানে যাওয়া নিষেধ মানে সেই জায়গাগুলো অলিখিত 'out of bound areas' ছিল আমাদের জন্য। আর ওই বয়সে যা নিষিদ্ধ তাই বেশি কৌতূহল জন্ম দিত। যারা সেসব জায়গায় গিয়ে ওইসব এলাকা ঘুরে আসত তারা অন্যদের কাছে একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওইসব জায়গার গল্প বলত। আর যথারীতি অন্যরা সুযোগ খুঁজত ওইসব নিষিদ্ধ এলাকায় যাবার জন্য।

আমাদের স্কুলে একটা বিরাট জলের ট্যাঙ্ক ছিল ঠিক স্কুল বিল্ডিঙের পিছনে মিল্কব্রেকের জায়গা দিয়ে হোস্টেলে যাওয়ার রাস্তায়। ওই ছোটোবেলায় সেই উঁচু কংক্রিটের জলের ট্যাঙ্কটাকে দৈত্যের মতো লাগত। মাঝে মাঝে দেখতাম জলের মিস্ত্রি (প্লামবার) সেই জলের ট্যাঙ্কের নীচের দরজাটার তালা খুলে ওপরে চলে যেত। এক রোববারে সেই দরজা খোলা পেয়ে আমাদের কয়েকজন বন্ধু সেইদিকে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। তারপর সেই কয়েকজন যখন সেই উঁচু খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক পরিদর্শন করতে লাগল তখন সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেদেরকে নীচের থেকে এক মাস্টারমশায় দেখে নিলেন। সেই মাস্টারমশায় নীচের থেকে ওদেরকে বকাঝকা করছে কিন্তু

ছেলেরা তো ওপর থেকে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তারপর যখন নেমে এল তখন তাদেরকে লঘু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। ছাড়া পাওয়ার পর সেই গুটিকয়েক বন্ধুরা তখন বুক ফুলিয়ে আমাদের কাছে গল্প করতে লাগল ওপর থেকে গোটা স্কুল ক্যাম্পাস, বিল্ডিংগুলো, ওপর থেকে নীচের লোকজনেরা কেমন দেখতে লাগছিল। তারমানে তখনকার দিনে ওটা ছিল গরিবের প্লেনে চড়া! সেইদিনই জেনেছিলাম যে ওই জলের ট্যাঙ্কে যাওয়ার সিঁড়িগুলো খুব নোংরা ও অন্ধকার। এক-শো দুটো সিঁড়ি ছিল আর ওপরে ঠিক 'ওয়াচ টাওয়ারের' মতো রেলিং দিয়ে ঘেরা ছাদ ছিল। পরবর্তীকালে আমিও ওখানে উঠেছি কিন্তু ততদিনে সেটা বাসি হয়ে গেছে তখন আর গল্প করার মধ্যে কিছু নতুনত্ব ছিল না।

আর একটা জায়গায় আমাদের যাওয়া-আসা ছিল সেটা হল হোস্টেল বা হাউসের ওপরে খোলা ছাদে। ঠিক সিঁড়ি ঘরের ওপরেই যে চিলেকোঠা সেই ‘এটিক’-য়ের কথা আমি আগেই লিখেছি তাই আর পুনরাবৃত্তি করছি না। আমরা সবাই বিভিন্ন হাউসে থাকতাম ঠিকই যেগুলো তিনতলা ছিল কিন্তু তিনতলার ওপরের খোলা ছাদে কোনোদিন যেতামও না আবার কাউকে যেতেও দেখতাম না। প্রথম যেদিন কয়েকজন মিলে লুকিয়ে ওপরে উঠলাম সেদিন মনের মধ্যে কী উত্তেজনা। যেন ওখানে যখের ধন দেখতে পাব। ওপরে গিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ ঘুরে দেখি ছাদটা বৃষ্টির জলে শ্যাওলা পড়ে গেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু গম্বুজাকৃতি তিন ফুটের পিলার। আসলে সেগুলো ছিল নীচতলার পিলারগুলোর অবশিষ্ট লোহাগুলোর ঢাকা অবস্থা। ওপর থেকে নীচের বাগান, ডি মার্কা বারান্দা, ডাইনিং রুম ইত্যাদি দেখতে বেশ লেগেছিল।

তিন নম্বর জায়গাটা হল ডাইনিং রুমের ভিতরে অন্দরমহলে কিচেনটা। জুনিয়র ক্লাসে তো ওইদিকে পা মাথাতেই পারতাম না। আর সিনিয়র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাত খুন মাফ। প্রায়ই কিচেনে ঢুকে কিছু ছেলে নিজের জন্য বিভিন্ন আবদার করত। যেমন, স্যালাড বানানো, গুঁড়ো লঙ্কা, পেঁয়াজ অতিরিক্ত পরিমাণে দাবি করা কিংবা লুকিয়ে রাখা এক্সট্রা খাবার জোরজবরদস্তি করে নিয়ে আসা। এখন ভাবি সেই কিচেনের

ভিতরটা সত্যিই খুব নোংরা থাকত। পরবর্তী কালে স্কুল রিউনিয়নে গিয়ে সেই কিচেন ভীষণ পরিষ্কার দেখলাম। রুটি থেকে সবজি কাটা, আলুর খোসা ছাড়ানো সব বিভিন্ন মেশিনের দ্বারা করা হচ্ছে। কয়লার উনুনের জায়গায় কুকিং গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে।

চার নম্বর জায়গাটা হল স্কুলের শেষপ্রান্তে বাউন্ডারি পার হলেই শিব মন্দির আর তার পাশের রাস্তাটা চলে গেছে একটা গ্রামের দিকে (কী নাম? মনে নেই) সেই রাস্তার দিকে যাওয়াও মানা ছিল। কিন্তু প্রায় রবিবারে আমরা অনেকেই সেই গ্রামের রাস্তায় ঘুরতে যেতাম। ওখানে যাওয়া দেখলেও বিশেষ কেউ কিছু বলত না, হয়তো-বা গ্রাম বলেই। টাউন হলে তো হুলুস্থুলু হয়ে যেত। সেটা তো গুরু পাপে পড়ে যেত।

আর একটা নিষিদ্ধ এলাকা হল প্রিন্সিপালের আম বাগান। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই বাগানের সাথে। বালিশের ওয়াড় নিয়ে নীচে একজন দাঁড়িয়ে থাকত, আর যে গেছো ছেলে ভালো গাছে উঠতে পারত (যেমন আমাদের গৌরব গোপাল!) সে চড়চড় করে গাছে উঠে কাঁচা আমগুলো পেড়ে প্রথমে দুই পকেটে ভরাত, একটা মুখে ঢুকিয়ে খেত আর তারপর বাকি আম পেড়ে ঝপাঝপ নীচে ফেলত হোস্টেলে নিয়ে যাবার জন্য। সেই বাগানে আবার একটা কাঁচা-মিঠা আমি গাছ ছিল আর বরাবর সবার লোভ থাকত ওই গাছের ওপর। আমাদের উৎপাতে বেচারা ওই আমগুলো শৈশবেই বিনষ্ট (না আমাদের ভোগে?) হয়ে যেত, কৈশোরও দেখতে পেত না, যৌবন তো দূর অস্ত!

বায়োস্কোপ, ছায়াছবি ও সিনেমা

“দেখো দেখো দেখো বায়োস্কোপ দেখো, দিল্লি কা কুতুব মিনার দেখো...” গানটা সুরবিহীন কবিতার মতো বলে যাচ্ছে দেহাতি লোকটা। সে এক হাতে ঘুঙুর বাজিয়ে আর অন্য হাত দিয়ে বড়ো বাক্সের ওপর ‘দ’-য়ের মত হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে চলেছে। বাক্সটা একটা স্ট্যান্ডে রাখা আর সেটার ঘুলঘুলি দিয়ে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা চোখ লাগিয়ে চলমান ফটো দেখছে। ওটার নাম বায়োস্কোপ। ছেলেবেলায় বায়োস্কোপ দেখলেই আমরাও ছুটে চলে যেতাম ঘুলঘুলিতে চোখ রাখা ছেলেটার পিছনে দাঁড়িয়ে কৌতূহল হয়ে জিগ্যেস করতাম সে কী দেখতে পাচ্ছে।

তখনকার দিনে বায়োস্কোপ দেখতে পয়সা লাগত তিন পয়সা একজন দেখলে, আর দরাদরি করে আমরা দুই ভাই পাঁচ পয়সায় দু-জনে দেখতাম। লম্বা স্থির ফটোর রিল একদিক থেকে আর একদিকে সরে যেত আর আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে দেখতাম। দেখা হয়ে গেলে যুদ্ধ জয় করার মতো বীরদর্পে ঘরে ফিরতাম।

আস্তে আস্তে সেই বায়োস্কোপ উঠে গেল। আগের মতো মাথার ওপরে বায়োস্কোপের বাক্স নিয়ে কেউ আর এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে না।

ততদিনে মফস্সল শহরে একটা সিনেমা হল তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের মফস্সল শহরে সিনেমা হলটার নাম ছিল ‘ওয়েস্টার্ন টকিজ’ যদিও কখনও ওয়েস্টার্ন সিনেমা আসত না। সবসময় পুরোনো বাংলা কিংবা পাতি হিন্দি সিনেমা চলত। প্রতি শুক্রবার সিনেমা চেঞ্জ হত আর সেইদিন সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় কী সিনেমা দিয়েছে ঘোষণা করার জন্য লোক আসত। তিনজন লোক বাজনা বাজাতে বাজাতে আসত। একজন ড্রাম বাজাত আর একজন লম্বা টিনের চোঙা একহাত দিয়ে ধরে বলা আরম্ভ করত তখন অন্য হাতটা থাকত কোমরে। খুব স্টাইলে দাঁড়িয়ে সিনেমার নায়ক-নায়িকা, খল নায়কের নাম ইত্যাদি রসিয়ে রসিয়ে বলত আর আমরা কাছে গিয়ে কান পেতে শুনতাম। বছরে হয়তো-বা একটাই সিনেমা দেখা হত কিন্তু ঘোষণা শুনে আর পোস্টার দেখে মনে হত যেন সিনেমাটা দেখা হয়ে গেল।

তখন সিনেমা হলে সবচেয়ে কম চল্লিশ পয়সাতে প্রথমদিকের রো-তে বসে সিনেমা দেখা যেত। কিন্তু সেখানে চারিদিকে বিড়ি সিগারেটের গন্ধে ম ম করত। পিছন দিকের রো-তে পঁচাত্তর পয়সা লাগত। টিকিটের জন্য প্রচণ্ড ভিড় হত আর সবচেয়ে বেশি ভিড় হত শুক্রবার আর রোববার ছুটির দিনে। রোজ তিনটে শো হত ম্যাটিনি শো, ইভিনিং শো আর নাইট শো।

ইন্টারভালে সিনেমা হলের ভিতর খোসা থাকা বাদাম কিনে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নুন দিয়ে না খেলে সিনেমা দেখা সম্পূর্ণ হত না।

তারপর বাহাত্তর সন থেকে সৈনিক স্কুলের হোস্টেলে। ওখানে মাঝে মাঝে মোটামুটি মাসে একবার পর্দা টানিয়ে খোলা মাঠে সিনেমা দেখানো হত। সাধারণত সিনেমাগুলো হত দেশাত্মবোধক কিংবা কারো আত্মজীবনীমূলক। মাঠের মধ্যে বসে সিনেমা দেখাটাও ছিল বাধ্যতামূলক। ভালো না লাগলে মশার কামড় খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আর ভালো লাগলে সম্পূর্ণ দেখে বেশ কিছুদিন তার রেশ লেগে থাকত। সাদা-কালো অনেক ইংরেজি সিনেমা দেখানো হত যার সিংহভাগই বুঝতাম না কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'ভালো ভালো' বলতে হত। অনেক দিন এমনও হয়েছে যে সিনেমা দুপুরে দেখানো হয়েছে। আবার অনেক সময় খোলা মাঠে সিনেমা দেখার সময় বৃষ্টি নেমে গেছে। কিংবা হাওয়া দেওয়ার জন্য পর্দা কাঁপাতে লাগল আর অভিনেতারা নাচছে মনে হত তখন।

কয়েক বছর এরকম চলার পর স্কুলে খোলা মাঠে সিনেমা দেখানো বন্ধ হল। তারপর থেকে আমাদেরকে বাসে করে টাউনে নিয়ে যাওয়া হত সিনেমা দেখানোর জন্য। তখন খুব মজা হত। সিনেমার সঙ্গে উপরি পাওয়া যেত বাইরের মুক্ত হাওয়া।

তবু মন ভরত না, সব সময় স্কুল পালিয়ে টাউনে গিয়ে সিনেমা দেখার সুপ্ত ইচ্ছা মাথায় ঘুরত। এখন ভাবি এটা কি শুধুই সিনেমার প্রতি টান না প্রতিষ্ঠান বা নিয়মের প্রতি বিদ্রোহী ভাব? সে যাইহোক স্কুল পালিয়ে টাউনে যাওয়া আর সিনেমা দেখার এক-একটা ঘটনা এখনও স্মৃতিতে সতেজ হয়ে আছে। ভালো কাজের থেকে খারাপ কাজ মানুষের কি বেশি মনে থাকে?

এবার আমাদের আরো পিছিয়ে যেতে হবে তখন চুয়াত্তর সন হবে আমরা ক্লাস সেভেনে পড়ি। স্কুলের হোস্টেলে ছিলাম। রবিবার ছুটির দিন একটু দেরি করে উঠে সবে ব্রেকফাস্ট করে ডাইনিং হলের সামনে ডি আকারের উঁচু সিমেন্টের খোলা বারান্দাতে বসেছি হঠাৎ খবর পেলাম আমাদের সঙ্গের তিনজন ছেলে রাত্রে পালিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল কিন্তু ধরা পড়ে যায় সিনিয়রদের কাছে।

আমাদের কৌতূহল বেড়ে গেল তাদের সঙ্গে দেখা করে সিনেমা দেখার অ্যাডভেঞ্চার শোনার জন্য কিন্তু তখন তাদের সকাল সকাল ডাক পড়েছে সিনিয়রদের রুমে শাস্তি পাওয়ার জন্য। শাস্তি মানে মার খাওয়া। একটা সময় তারা শাস্তি খেয়ে বেরিয়ে এল। আমরা সহানুভূতি দেখানোর আগেই তারা তাদের 'কালা সোনা' সিনেমা দেখার গল্প বলাতে ব্যস্ত হয়ে গেল আর আমরাও শাস্তির কথা ভুলে গিয়ে সিনেমার দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। সে যাত্রায় স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখে তাদের গুরু

পাপে লঘু শাস্তিই হল যেহেতু কথাটা হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপালের কানে যায়নি। সিনিয়রদের শাস্তি খেয়েই ঘটনাটা মিটে গেল।

আসলে তখন বয়সটাই ওইরকম ছিল যখন শাস্তি খেয়ে কাঁদা মানে 'প্রেস্টিজ পাংচার'। নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা অমান্য করা মানে গর্বের ব্যাপার। এই স্টেজ সবাই একটা বয়সে পার করে কিন্তু বেশিরভাগরাই ভুলে গিয়ে পরে নীতিবাগিশ হয়ে যায়।

সেই 'কালাসোনা' সিনেমার গল্প রসিয়ে রসিয়ে শোনানো, পারলে অভিনয় করে দেখানো, ডাইলগ হুবহু নকল করে বলা ইত্যাদি আমাদের বন্ধুরা এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করল যে সেই সিনেমাটা না দেখেও আমাদের দেখা হয়ে গেল আর মনের মধ্যে আঁকাও রয়ে গেল।

কিন্তু স্থায়ীভাবে যেটা দাগ কাটল সেটা হল স্কুলের হোস্টেল পালিয়ে রাত্রে সিনেমা দেখা যায়, ধরা না পড়েও হোস্টেলে ঘুরে আসা যায়। আর সিনিয়র দাদারা জানতে পারলেও শারীরিক শাস্তি দেবে তার বেশি কিছু না যার প্রলেপ একদিন মুছে যাবে।

তারপর স্কুলের হোস্টেলে গতানুগতিকভাবে অনেক বছর কেটে গেছে। একবার দোলের দিন সকালে ফাগুয়া খেলে স্নান সেরে খাওয়ার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গড়াচ্ছে আর আড্ডা দিচ্ছে। সেদিন ছিল ছুটির দিন সঙ্গে ছিপছিপ বৃষ্টি পড়ছিল

দুপুরে। ব্যাস ইচ্ছে গেল হোস্টেল থেকে পালিয়ে এই ফাঁকে দুপুরে সিনেমা একটা দেখে আসা যায়। একে ছুটির দিন সঙ্গে হোলি খেলে সিনিয়ররা, টিচাররা এমনকী গেটের চৌকিদারও সেদিন ক্লান্ত। মানে গোটা ক্যাম্পাসের পরিবেশটাই একটা ঢিলেঢালা ভাব। সুতরাং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য অলোকের সঙ্গী হলাম আমি। দু-জনে দুটো কালো রঙের ‘ডাকব্যাকে’-র বর্ষাতি (Raincoat) জোগাড় করে পরে নিলাম। তখন নিজেরাই নিজেদেরকে দেখে আর চিনতে পারছি না মনে হচ্ছে নিজেকে বেতাল ও ম্যানড্রেকের মতো! ছিপছিপে বৃষ্টিতে রেনকোট পরে আরামে স্কুল থেকে ফাঁক গলে বেরিয়ে গেলাম। বাস ধরে টাউনও পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সিনেমা হলে পৌঁছে দেখি সিনেমা আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে আর টিকিটও অবশিষ্ট নেই। সিনেমা তো সিনেমার টাইমে চলবে সেকী আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে?

সত্যি কি সেদিন আমরা সিনেমার টানে গিয়েছিলাম না নিয়মভাঙার খেলা খেলতে গিয়েছিলাম? সুতরাং সিনেমা দেখতে না পেয়ে টাউনে এলোপাথাড়ি একটু ঘোরাঘুরি করে নিলাম। হোস্টেলে না পাওয়া জিনিস একটু চেখে নিলাম তারপর তো ফেরার পালা। বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি একটাও লোকাল বাস নেই যেটা স্কুলের কাছাকাছি থামবে। তবে একটা এক্সপ্রেস বাস পাওয়া গেল যেটা রাঁচি যাবে কিন্তু স্কুলের আশপাশে কোথাও

থামবে না। উপায়হীন হয়ে ওই বাসেই উঠলাম তা নাহলে বিকেলের রোল-কলের আগে স্কুলে পৌঁছানো যাবে না। আমাদের প্ল্যান ছিল স্কুলের অনেকটা আগেই রাস্তাটাই একটা ভয়ংকর টার্ন ছিল সুতরাং বাস যতই এক্সপ্রেস বাস হোক সেটা স্পিড কমাবে আর আমরা সেই ফাঁকে নেমে পড়ব। সুতরাং প্ল্যানমাফিক বাসের পিছনের সিঁড়িতে যেখান দিয়ে মাল ওঠানো হয় সেটা ধরে দাঁড়িয়ে গেলাম দু-জনে। ততক্ষণে বাস চলতে শুরু করে দিয়েছে আর আমরা দু-জনে বৃষ্টির মধ্যে রেনকোট পড়ে আধা ভিজে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সেই রাস্তার বাঁকটা আসবে। যথাসময়ে সেই বাঁকটা এল কিন্তু বাসের স্পিড একটুকুও কমল না। আর নামতে তো হবেই তা নাহলে কোথায় নিয়ে গিয়ে থামবে ঠিক নেই হয়তো-বা রাঁচি যাওয়ার পথে অন্য কোনো শহরে গিয়ে থামবে। সুতরাং রিস্ক নেওয়া যায় না। জয় দেবী দুর্গার নাম নিয়ে অলোক চলন্ত গাড়ির থেকে সিঁড়ি থেকে রাস্তায় নেমে গেল। চলন্ত গাড়ি থেকে নামলে সাধারণত একটু দৌড়াতে হয় গাড়ির সঙ্গে সেটাও করল কিন্তু বাসের প্রচণ্ড স্পিড থাকার জন্য অলোক রাস্তায় পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার পোজ নিয়ে ছ্যাঁচড়াতে লাগল আর আমি বাসের সিঁড়িতে ঝুলতে ঝুলতে সেই দৃশ্য দেখলাম। ওই বয়সে আমারও আত্মবিশ্বাস কম ছিল না আমি মনে মনে ভাবলাম অলোক ঠিকভাবে নামতে পারেনি বলে পড়ে গেল আমি ঠিক উতরে যাব। যেই ভাবা সেই কাজ আমিও ঠাকুরের নাম নিয়ে দিলাম চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপ। ব্যাস সেই একই ঘটনা

পুনরাবৃত্তি হল। আমিও রাস্তায় পড়ে ছ্যাঁচড়াতে লাগলাম। আমি তখন সামনে দেখতে পাচ্ছি অলোক রাস্তায় পড়ে গেছে আর আমিও সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করার পোজ নিয়ে রাস্তায় ছ্যাঁচড়াচ্ছি। বাসটা স্পিডে বেরিয়ে গেল আমাদেরকে রাস্তায় রেখে। ভাগ্য ভালো যে পিছন থেকে কোনো ট্রাক বা বাস আসছিল না। সব কিছু মূহুর্তের মধ্যে হয়ে গেল। ধাতস্থ হতে অল্প সময় লাগল। আমরা দু-জনেই উঠে দাঁড়ালাম মুখে লজ্জাযুক্ত কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে। ভাগ্যভালো আশপাশে কেউ ছিল না সেই দৃশ্য দেখার, থাকলে সেদিন প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যেত। ওই বয়সে বিপদ থেকে বাঁচার থেকে প্রেস্টিজ পাংচার না হওয়াটাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।

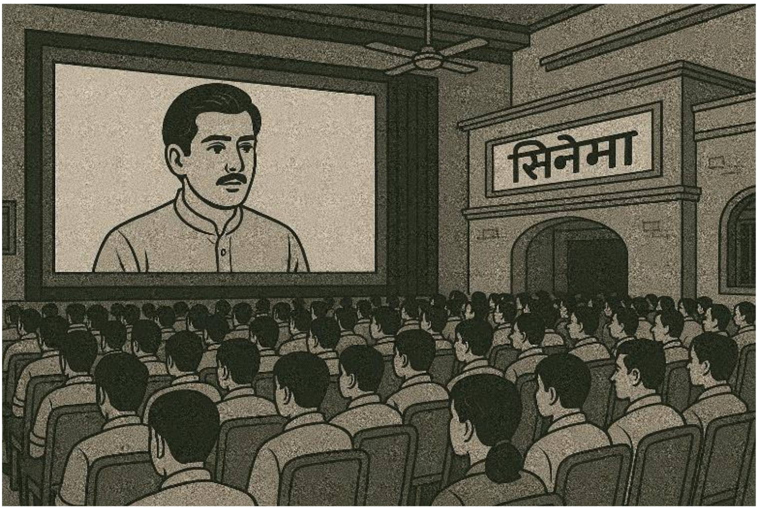

রাস্তা থেকে নেমে মাঠ পেরিয়ে তারকাঁটা টপকে নির্বিঘ্নে ধরা না পড়ে স্কুলে পৌঁছালাম। ততক্ষণ অব্দি দু-জনেই কেউ

ব্যাথা পাওয়ার কথা বলিনি। এত বড়ো যে বিপদ গেল কেউ মুখ ফুটে বলিনি। কিন্তু রুমে এসেই খেয়াল করলাম যে রেনকোটের কনুই দুটো আর হাঁটুর কাছে কিছু অবশিষ্ট নেই। প্যান্ট অব্দি ছিঁড়ে চামড়া থেকে রক্ত ঝরছে। পায়ের জুতো দুটোই আঙুলের কাছে মোজা সুদ্ধ ছিঁড়ে গেছে। ততক্ষণে গোটা শরীরে ব্যাথা অনুভব করছি, যেন যুদ্ধ করে ফিরছি! শরীরে ব্যাথা কিন্তু মনে প্রচণ্ড ফুর্তি এইরকম সফল এডভেঞ্চার করার জন্য। কিন্তু রেনকোটটা তো আমাদের নিজেদের না সেটা তো ধার করা। এবার ওই ছেঁড়া রেনকোট ফেরত দেব কী করে? সে এক অন্য গল্প সেটা অন্য আরেকদিন বলা যাবে।

‘জো পকরা গেয়া ও চোর হ্যায় ঔর নেহিতো সব শরিফ’

“স্যার পরীক্ষার খাতার প্যাকেটের সিলটা দেখে নিন তারপর খুলব”। আমি এবার যখন ডাক্তারির স্নাতোকত্তোর (এম.ডি.) পরীক্ষা নিতে গিয়েছিলাম তখন প্রতিবারের মতো পরীক্ষার সিল করা খাতার প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে কথাটা বলেছিল এক সহযোগী অধ্যাপক। আমি গম্ভীর মুখে খামটা খুলে উত্তরপত্রগুলো বার করে দেখতে লেগেছিলাম। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল স্কুল জীবনে প্রথমবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কথা যখন আমরা ক্লাস সেভেনে ছিলাম। তখন প্রশ্নপত্র কার্বন পেপার দিয়ে টাইপ করা হত। তারপর সেই কার্বন পেপার ফেলে দেওয়া হত অফিসের ডাস্টবিনে। সেই সময় ঠিক General knowledge (GK) পরীক্ষার আগে কেউ একজন সেই প্রশ্নপত্র টাইপ করা কার্বন পেপার হাতে পেয়ে যায়। ব্যাস কেল্লাফতে! সেখান থেকে প্রশ্নগুলো উদ্ধার করে সবাই সেবার GK তে ছাঁকা ছাঁকা নম্বর পেয়েছিল। সেবার কিন্তু স্কুলের কর্তৃপক্ষ কাছে সেটা রহস্যই থেকে গিয়েছিল যে এত কঠিন প্রশ্ন হওয়ার পরেও কীভাবে সব ছাত্রেরা এত বেশি নম্বর পেল।

পরের ঘটনাটা যেটা মনে পড়ে গিয়েছিল সেটা আরো রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক। তখন উনিশ-শো সাতাত্তর সাল, আমরা তখন সৈনিক স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ি। পড়াশোনার চাপ বাড়ছিল এদিকে মনোযোগ গিয়েছিল কমে। মন তো তখন কৈশোরের হাওয়ায় উড়ছে।

ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষার আগে খবর পেলাম এবার ফাইনাল পরীক্ষার খাতা খুব কড়াভাবে দেখা হবে যাতে ক্লাস টেনে ভালো ছেলেরাই প্রমোশন পায়, বাকিরা যাতে ফেল করে স্কুলে আর ঘুরে না আসে। তারমানে ক্রিমটাকে ক্লাস টেনে ছেঁকে নেওয়া হবে আর অবশিষ্ট জাবড়া বাদ পড়বে! তাহলে ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষাতে সমষ্টিগতভাবে স্কুলের রেজাল্ট ভালো হবে। বোঝো ব্যাপারটা! তখন আমাদের ক্লাসে দুটো সেকশন মিলিয়ে পঞ্চাশ জন মতো ছেলে আর সবাই একে ওপরের হরিহর আত্মা। সবার মাঝে খুনসুটি ঝগড়া হলেও প্রচণ্ড একতা। সুতরাং সেই খবর পেয়ে সবাই টেনশনে পড়ে গেল। সবাই নড়েচড়ে বসল। আর আমার মতো ছেলেরা যারা পড়াশোনায় মধ্যম তারা পড়াশোনা করার মাত্রা বাড়িয়ে দিল আর অনেকে হাল ছেড়ে দিয়ে যথারীতি পড়াশোনা ছাড়া বাকি কাজে মনোযোগ দিল বেশি। একজন সেন্টিমেন্টাল হয়ে ক্লাস টেনে ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে বিদায় পর্বও সেরে নিল।

সেই ক্লাস নাইনে সবচেয়ে কঠিন লাগত ইতিহাস। বেশিরভাগ ছেলের কাছেই সেই ইতিহাস ছিল বিভীষিকা কেন সেটা তখন বুঝতে পারিনি। এখন গল্পের মতো ইতিহাস পড়তে ভালোই লাগে কিন্তু হয়তো-বা সেটাকে রসকষহীন ভাবে পড়ানোর জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সভ্যতার আদব কায়দা একইভাবে বারবার বলার জন্য কিংবা লম্বা লম্বা উত্তরগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ করাটা আমাদের জন্য শক্ত লাগত। যারজন্য বেশিরভাগ ছেলেদের ভয় ছিল ইতিহাস পরীক্ষাটাকে।

যথারীতি ঠিক সময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হল কিন্তু ভাবা অনুযায়ী ইতিহাস প্রশ্নপত্র খুব কঠিন এল। পরীক্ষার পর সবার মন খারাপ। কয়েকজন খালি খাতা জমা দিয়ে এসেছিল সুতরাং পাশ করার কোন সুযোগও ছিল না। তারমানে বেশ কিছু বন্ধু ক্লাস টেনে আর ফিরে আসবে না। সেটা অনেকেরই হজম হচ্ছিল না কিন্তু ফল তো কর্ম অনুযায়ী হবে! জীবনে অনিশ্চয়তার মধ্যে অনেক সময় ঝুঁকি নিতে হয়। ঝুঁকি নিয়ে সাফল্য এলে পরে সেটা বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলা যায়।

ইতিহাস পরীক্ষার কাঁটাটা শান্তিতে ঘুমাতে দিচ্ছিল না। কৈশোরের কারো উর্বর মস্তিষ্ক থেকে তখন এক ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব বার হয়েছিল যেটা করতে পারলে পরীক্ষায় পাশ করে ক্লাস টেনে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।

কী সেই ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব? সব পরীক্ষার খাতাগুলো যে রুমে রাখা সেটা ছিল সহকারী হেডমাস্টারের রুম। সব উত্তর লেখা খাতাগুলো একসঙ্গে রোল করে জড়িয়ে স্যারের টেবিলে স্তূপ করে রাখা হত। ওখানে কিছুদিন রাখার পরে সব পরীক্ষা শেষ হলে খাতাগুলো নির্দিষ্ট টিচারকে দিয়ে দেওয়া হত। গোপনে সেই সহকারী হেডমাস্টারের রুমে ঢুকে যদি খাতাগুলো আনা যায় তারপর সেই খাতাতে যথারীতি সঠিক উত্তরগুলো লিখে আবার যদি যথাস্থানে রেখে দেওয়া যায় তবেই পাশ করে ক্লাস টেনে ওঠা যাবে। এই উদ্ভট পরিকল্পনার মধ্যে অনেকগুলো ifs and buts আছে আর চিন্তাটাও গোরু গাছে ওঠার মতো।

গুটি কয়েকজন বন্ধু কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা modus operandi বানালো গোপনে কাউকে কিছু না জানিয়ে। কোন কাক-পক্ষীও টের পেল না। সেই সহকারী হেডমাস্টারের রুমের দরজাটা ছিল এক পাল্লা আর দরজার ওপরে ছিল দুই বাই তিন ফুটের এক ভেন্টিলেটর। ওই ভেন্টিলেটরের মাঝখানের জায়গাটা লোহার শিক দিয়ে দুটো ভাগে ভাগ করা। সেই ছোট্ট জায়গা দিয়ে একটা ছোটো মাপের মাথা ও শরীর একটু কসরত করলে ঢুকে যাবে। সেটাই রুমে ঢোকার রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হল। ঠিক রাত্রে খাওয়ার পরে নাইন আর টেনের সিনিয়র ছাত্ররা সবাই যখন প্রেপ ক্লাসে পরীক্ষার পড়াতে ব্যস্ত। অল্প রাত হতেই ক্লাস টেনের ছেলেরা হোস্টেল চলে গেল শুতে। ঠিক সেই

সুযোগের অপেক্ষাই তারা করছিল। একজন ছোটো সাইজের সঙ্গের বন্ধুকে টেবিলের ওপরে উঠে কাঁধে চাপিয়ে সেই রুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে ভিতরে চালান করে দেওয়া হল। সে আবার টর্চ নিয়ে অন্ধকারে ক্লাস নাইনের ইতিহাস খাতার রোলটা বগলদাবা করে সেই একই পদ্ধতিতে নির্বিঘ্নে বার হয়ে ক্লাসরুমে এল। এসে সেইসব ছেলেদের যাদের পরীক্ষা খারাপ হয়েছিল পাশ করার আশাই ছিল না তাদেরকে ডেকে নাম অনুযায়ী খাতা বার করে বই বার করে লিখতে বলা হল। তবে ethics বা নীতি আমাদের ঠিক ছিল। সবাইকে খাতা লিখতে দেওয়া হয়নি, শুধু যাদের পরীক্ষা নিতান্ত খারাপ হয়েছে তারাই লিখতে পারবে as life line! এটা নম্বর বাড়ানোর জন্য নয়। আমরা অনেকে তাদেরকে অন্যদের খাতা দেখে বলতে লাগলাম আর তারা দ্রুত লিখতে লাগল। সেই দলে আমাদের এক ডে স্কলার বন্ধু ছিল। সে স্কুল ক্যাম্পাসে কোয়ার্টারে থাকত। এদিকে রাত্রি অনেক হয়ছিল আর সে বাড়ি ঢোকেনি বলে তার বাবা আমাদের ক্লাসরুমে এসে হাজির। উনি এসে দেখলেন সবাই খুব পড়াশোনায় ব্যস্ত। আসলে ওইরকম বিপর্যয়ে ওই বয়সে মনে হয় অভিনয় করার ক্ষমতাটা স্বতস্ফূর্তভাবে আসে! স্যার এসে আমাদেরকে হোস্টেলে যেতে বলে গেলেন আর সেই বন্ধুকে নিয়ে ঘরে গেলেন।

তারপর আবার খাতা রাখার পালা। সেই একই পদ্ধতিতে খাতাগুলো রোল করে সুতো দিয়ে বেঁধে যথাস্থানে রাখা হল। ভাগ্যিস সেই যুগে কোনো CCTV বা চৌকিদার ছিল না যারজন্য কোনো প্রমাণ থাকেনি। কিন্তু যতই সাবধানতা অবলম্বন করুক, চোর তো প্রমান রেখে যাবেই। পরেরদিন সকালে সহকারী হেডমাস্টার যখন সেই রুম খুললেন দেখলেন দরজার সামনেই অনেক ধুলো এক লাইনে পড়ে আছে। আসলে সেটা ছিল অনেক দিন না খোলা ভেন্টিলেটর খোলার জন্য যতরাজ্যের জমে থাকা ধুলোবালি নীচে পড়েছিল।

তারপর যখন ফাইনাল রেজাল্ট দিল অভাবনীয়ভাবে সবাই পাশ করে ক্লাস টেনে ফিরে এল।

তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে। যাদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে সেদিন সেই দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারের আইডিয়া কার্যকরী হয়েছিল আর যারা যারা সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছিল তারা সবাই এখন বড়ো বড়ো জায়গায় বড়ো বড়ো গম্ভীর পোস্টে অধিষ্ঠিত।

বর্তমানে আমিও অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখন একটা ডিপার্টমেন্টের হেড। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, খাতা যখন আমার হেফাজতে রাখতে হয় তখন আলমারিতে চাবি মেরে একবার হলেও সেই সাতাত্তর সনের অবিশ্বাস্য ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি

ক্লাস ইলেভেনে ওঠার পর আমরা বেশ রিলাক্স ফ্রি থাকলাম। আমাদের মধ্যে একটা হামবড়া ভাব এসে গিয়েছিল। একে বড়ো হয়ে গিয়েছি, ম্যাট্রিক পাশ করে গিয়েছি আর সবচেয়ে দামি কথা হল তখন আমাদের ধ্যান-জ্ঞান-প্রেমে লক্ষ্য হল NDA-তে যেতে হবে। এই আর্মি (সৈনিক) স্কুলের আসল উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে এন.ডি.এ.-তে জয়েন করিয়ে ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসার বানানো।

যারফলে ক্লাস ইলেভেনে পুরো একবছর সবাই এন.ডি.এ.-তে যাওয়ার জন্য স্বপ্ন ও প্রস্তুতি নিতে নিতে বছরটা পার হয়ে গেল। সেই বছরেই ইউ.পি.এস.সি. পরীক্ষা দিতে সবাই কলকাতা গেলাম। মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাশ করে এস.এস.বি. দিতে গেল।

বাস্তব বড়োই নিঠুর! আস্তে আস্তে আমরা অনেকে বুঝে গেলাম যে এই এন.ডি.এ.-র স্বপ্ন মরীচিকার পিছনে ছোটার মতো। ততদিনে ক্লাস ইলেভেনের বোর্ড পরীক্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে। পরীক্ষায় বসে বুঝতে পারলাম অনেক কিছুই শেখা হয়নি। পরীক্ষার রেজাল্ট নিজের দুর্বলতাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

রেজাল্টের পর আমাদের তিন জন বন্ধু এন.ডি.এ.-তে জয়েন করতে চলে গেল। সেদিনকার আমাদের আবেগ ছিল ঈর্ষা মিশ্রিত ভালোলাগা ও খারাপ লাগার মিশ্রণ।

আমরা ক্লাস টুয়েলভে উঠে গেলাম। স্কুলের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে সিনিয়র। আমাদের অবস্থা তখন, 'হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়,

একটি কোথা হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়।...'

আমাদের বন্ধুদের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আর আমাদের মধ্যে চোরাবালির মতো একটা অজানা ভয় ও আশঙ্কা জমা হচ্ছে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে।

সবাই চোখ-কান বুজে পড়ায় মন দিল। সবার মধ্যে একটা সিরিয়াসভাব এসে গেল। চিন্তা, কীভাবে ক্লাস টুয়েলভে ভালো রেজাল্ট করা যায়। কয়েকজন আবার হাল ছেড়ে দিয়ে বিন্দাস জীবন কাটাতে লাগল।

কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ কয়েকজন (পাঁচ জন) সহপাঠী দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে এন.ডি.এ.-তে চলে গেল।

সেইবার আমি ছাড়া অনেকেই ইউ.পি.এস.সি. পাশ করে এস.এস.বি. ইন্টারভিউ দিতে গেল। কিন্তু বেশিরভাগ ফিরে এল খালি হাতে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মেডিক্যাল টেস্ট পাশ করে স্বপ্ন নগরী এন.ডি.এ.-তে জয়েন করল। তারমানে আমাদের গোটা

ব্যাচের মধ্যে মাত্র আটজন সেই লক্ষ্যভেদ করল। আর আমরা তাদের এস.এস.বি. ইন্টারভিউয়ের গল্প শুনে কল্পনার জাল বুনতে লাগলাম।

এদিকে ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষা এগিয়ে আসছে কিন্তু তারথেকেও বেশি উৎকণ্ঠা প্রিয় স্কুল ও বন্ধুদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। একনাগাড়ে আটবছর এই স্কুলে থেকে অজান্তে নিজের বাড়িটাই অজানা লাগত। বাড়িতে নিজেকে সাময়িক গেস্ট মনে হত। ততদিনে বাড়ির আশপাশের বন্ধুরা দূরে সরে গেছে। তাদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু বাড়িতে ঘুরে যাওয়ার পর ওদের সঙ্গেই তো সময় কাটাতে হবে।

ক্লাস টুয়েলভের ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম ১৯৮০ মার্চ মাসে (৪ই মার্চ)। এবার যাবার পালা। প্রত্যেকটা হাউস থেকে আমাদের 'ফেয়ারওয়েল' জানানো হল। আমাদের টেগোর হাউসের ফাংশনে আমরা যাদের বিদায় সম্ভাষণ ছিল আমরা একসঙ্গে একটা সমবেত সংগীত গাইলাম। অনেক চিন্তাচর্চা করে আমাদের অভয়দা এক হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় গানের সুর নকল করে সুন্দর একটা গান রচনা করল। বন্ধু শুভাশীষ হারমোনিয়ামে গানটা উঠিয়ে সুর দিল আর আমরা বাকিরা সবাই গলা মেলালাম। সেই সমবেত গান গাওয়ার দুর্মূল্য গ্রুপ ফটোটা এখনো আমার কাছে আছে।

গানটা ছিল 'শর্মিলী' সিনেমার, যেটা এখনো আমার মনের ভিতরে গেঁথে আছে।

'খিলতে হ্যায় গুল ইঁহা, খিলকে বিখড়নে কো

মিলতে হ্যায় দিল ইঁহা মিলকে বিছাড়নে কো....'

এই গানটা খুব অর্থপূর্ণ ছিল ওই পরিস্থিতিতে।

এবার যাওয়ার পালা। ভারাক্রান্ত মনে নিজেদের জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম। সবাই একে অপরের ঠিকানা লিখে একটা ছোটো খাতায় লিখে রাখলাম। অনেকে আবার স্মৃতি হিসেবে ঠিকানার সঙ্গে কিছু উদ্ধৃতিও লিখিয়ে নিল। যেমন,

"বন্ধু তুমি বন্ধু হয়ে জনম জনম থেকো, অন্য বন্ধু পেয়ে তুমি আমায় ভুলোনা কো"।

"শিশিরে কি ফোটে ফুল বিনা বরষনে,

চিঠিতে কি মেটে আশা বিনা দরশনে।"

অনেকে সবার পাসপোর্ট ফটো জমা করে রাখল। হয়তো-বা সেইগুলোই হবে ভবিষ্যতে গোটা জীবনের পাথেয়। তখন তো আর মোবাইল ফোন ছিল না। কয়েকজনের ল্যান্ডফোন ছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের কাছে সেটা ছিল অজানা। চিঠিপত্র লিখেই একে ওপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে আর চিঠি লিখতে হলে সঠিক ঠিকানা জানা খুবই জরুরি।

এখন আমার আশ্চর্য লাগে যে এত ঠিকানা লেখালেখি করেও অনেক বন্ধু ক্যারামের গুটির মতো ছিটকে গেল আর আজ অব্দি পঞ্চাশ বছর ধরে আর যোগাযোগ রাখার তাগিদ বোধ করল না।

ঘরে ফেরার দিন স্থির হয়ে গেছে। বিকেলের কলকাতার ট্রেনে কলকাতার ছেলেরা উঠে যাবে আর আমরা গুটিকয়েক জন বন্ধু পরেরদিন সকালে অন্য ট্রেন ধরব।

স্কুলবাসে করে পুরুলিয়া স্টেশন অব্দি নিয়ে যাওয়া হবে। সবাই যে যার ট্রাঙ্ক, পুরোনো হোল্ডল বাসে উঠিয়ে নিল। বাসের বাইরে আমাদের শেষ বিদায় জানাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের হাউস মাস্টার, কিছু প্রিয় টিচার আর জুনিয়র ছাত্ররা। আমরা টিচারদেরকে প্রণাম করে যতটা সম্ভব হাসিমুখ করে বাসের ভিতরে সিটে বসলাম। এক বন্ধুর আবেগ আর বাঁধ মানল না মিস্টার টি পি দাস স্যারকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। শেষমেষ তাকে কোনোমতে বাসে ওঠানো হল। আমাদের স্কুল বাস আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল ডাইনিং হলের সামনে। যথারীতি ড্রাইভার সিটে গম্ভীর মুখে বসে ছিল আমাদের পরিচিত সুনীলদা।

অল্প পরেই বাস ছেড়ে দিল আর আমরা জানলা দিয়ে হাত নাড়াতে লাগলাম। আমার মনে পড়ে গেল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই লাইনগুলো—

‘কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?

তারি রথ নিত্য উধাও।

জাগিছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন

চক্রে পিষ্ট আধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।

ওগো বন্ধু,...’

আস্তে আস্তে বাস এগোতে থাকল স্কুলের ভিতরের পিচ রাস্তা দিয়ে আর যারা বিদায় জানাতে এসেছিল তারা দূরে সরে যেতে যেতে ছোটো হয়ে গেল। আমি পকেট থেকে রুমালটা বার করলাম। হঠাৎ দেখলাম চোখটা ঝাপসা হয়ে রাস্তার পাশের

গাছপালা আর দেখতে পাচ্ছি না। বাসের ভিতরে তখন সবাই নিস্তব্ধ।

‘...হে ঐশ্বর্যবান
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।’

উত্তরকথা

সৈনিক স্কুল থেকে ১৯৮০তে বার হওয়ার পর আমরা সবাই ক্যারামের গুটির মতো চারিদিকে ছিটিয়ে পড়লাম। তখন তো আর মোবাইল ফোন ছিল না, গুটিকয়েক বন্ধুদের বাড়িতে ছিল ল্যান্ডফোন। সেই ফোনে ফোন করা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ। যোগাযোগের রাস্তা ছিল চিঠিপত্র কিংবা গিয়ে সামনাসামনি দেখা সাক্ষাৎ করা। যারফলে কলকাতার বন্ধুদের একে অপরের সঙ্গে অনেকের যোগাযোগ থেকে গেল। আর আমাদের মতো মফস্সলের ছেলেরা কাটা ঘুড়ির মতো দূরে হারিয়ে যেতে থাকলাম।

বেশ কিছুদিন চিঠি চালাচালি হল কিন্তু তারপর যে যার ভবিষ্যত কেরিয়ার নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে গেল জীবন যুদ্ধে।

তারপর? সবচেয়ে আগে এন.ডি.এ.-তে যাওয়া বন্ধুরা অফিসার হিসেবে একটা ভদ্রস্থ্ পরিবেশে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। সময়ের তালে তালে কেউ-বা কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন নিয়ে চাকরিতে ঢুকল। অনেকে ব্যাঙ্কে চাকরি করতে ঢুকল। গুটিকয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকে চারবছর পার করে ভালো চাকরিতে ঢুকে পড়ল। কয়েকজন স্কুল কলেজের মাস্টারমশায় হয়ে গেল। আর অনেকে বিদেশে হাবিস হয়ে গেল।

আর আমার মতো যারা শখের ডাক্তারি পড়তে ঢুকল তারা সেখানে চোখকান বুজে ঘানি টানতে টানতে বারো বছর কাটিয়ে দিল 'আচ্ছে দিন' এর আশায়। শেষের দিকে যৎকিঞ্চিৎ স্টাইপেন্ড।

ততদিনে সবার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা তখন পালহীন নৌকার মতো ভেসে চলেছি উজানে। হঠাৎ করে কোন বন্ধুর সাথে দেখা হলে একে ওপরের খবর নেওয়া আর কানাঘুষোয় শোনা অন্য বন্ধুদের খবর শোনা। অনেক কয়েকজন বন্ধু ঠিকানাবিহীন হয়ে জীবন থেকে হারিয়েই গেল। সেই সময় সেই পুরোনো সৈনিক স্কুলে যাওয়া কিংবা স্মৃতি রোমন্থন করা ছিল একপ্রকার বিলাসিতা।

তারপর হঠাৎ করে আমাদের এক বন্ধু কর্নেল অপূর্ব সামন্ত আর্মিতে পোস্টিং হল দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে। সেটাই

আমাদের সবার মাঝে যোগাযোগের সেতুবন্ধন ডেকে আনল। অপূর্ব নিয়ম করে একজন বন্ধুকে ফোন করে আর তারথেকে অন্য একজনের ফোন নম্বর ও নাড়িনক্ষত্র জেনে নেয়। গবেষণাক্ষেত্রে এইরকম জরিপ করাকে বল হয় ‘স্নো-বল টেকনিক’। আর্মড ফোর্সের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসুবিধা হল না কিন্তু আমাদের মতো অসামরিক আম জনতার মধ্যে মিশে থাকা বন্ধুদের টেনে বার করতে তাকে বেশ মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল নিশ্চয়। আস্তে আস্তে সেই পুরোনো বন্ধুদের লিস্ট বাড়তে লাগল। ততদিনে আমিও ডিব্রুগড়ে মেডিক্যাল কলেজে চাকরি ও ডাক্তারি প্রাকটিস করে ল্যান্ডফোনের মালিক হয়ে গেছি। সুতরাং লটারি পাওয়ার মতো আমিও সেই নেটওয়ার্কে ঢুকে গেলাম। সেই দিনগুলো নিত্যনতুন বিভিন্ন পুরোনো বন্ধুদের হদিস মিলতে লাগল। সত্যি, অপূর্ব অপূর্ব এক কাজ করল।

তারপর ২০০৭ সালে আমাদের ক্লাসের প্রথম রিইউনিয়ন হল কলকাতায়। অধিকাংশ বন্ধুরা সবাই নিজেদের পরিবার নিয়ে এসেছিল কিন্তু ততদিনে তো আমরা কৈশোর পার করে পূর্ণ যৌবনে সাঁতার কাটছি। সবার মধ্যে এত পরিবর্তন এসে গিয়েছিল যে একে অপরকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল। আবার নতুন করে পরিচয় ও পরিচিত হয়ে সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিতে হল।

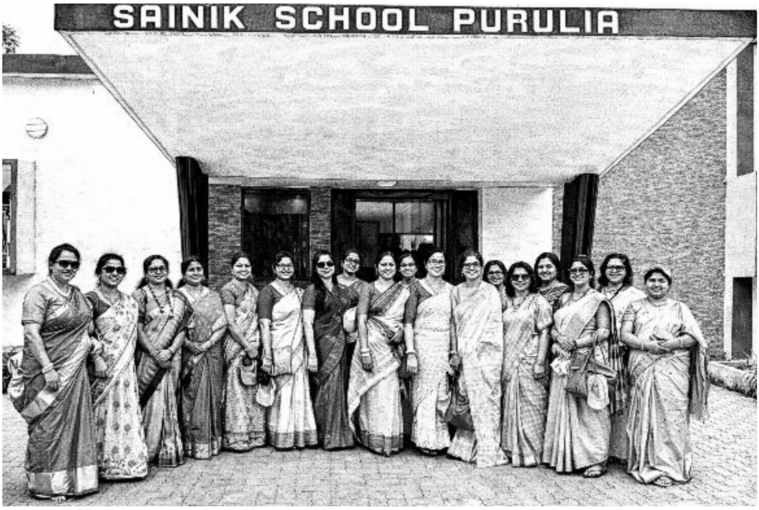

আমাদের জীবনে সেইদিনটা নিশ্চয়ই একটা মাইলস্টোন।

তারপর ২০১২ সনে সৈনিক স্কুলের সোনালিজয়ন্তীতে আমরা যোগ দিলাম। এখন মোটামুটি প্রতি বছর আমাদের রিইউনিয়ন হয় কলকাতার আশপাশে। আমার মতো দূরের বন্ধুরা কলকাতা গেলে হঠাৎ করে 'মিনি রিইউনিয়ন' হয়।

বন্ধুদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হলে আমরা যাই-না-যাই সবাই মিলে একসঙ্গে কিছু উপহার কেনা হয়। যতজন পারে সেই বিয়েতে একরকমের ড্রেস পরে খুব হইহুল্লোড় করা হয়।

এমনকী কোনো বন্ধুর বিপদ আপদে সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এখন মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপের যুগে সব বন্ধুরাই হাতের মুঠোয়। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে আবার আমরা নস্টালজিক হয়ে ফিরে যাই সেই স্কুলের কৈশোর দিনগুলোতে আর আড্ডা দিতে থাকি—সেই ফিরে দেখা স্মৃতি কথায়। আমরা ভুলে যাই নিজের বর্তমান অবস্থান। শুধু থাকে খোলা মনে খোলা আকাশের নিচে অটুট বন্ধুত্ব।